Pushpito Jonaki

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

পুষ্পিত জোনাকি

গল্প সংকলন

গার্গী ভট্টাচার্য

আমার দাদু,

গবেষক ঁনিখিল রায়কে---

হিম

---রায়া ও রায়া, রায়া ! হাঁকতে হাঁকতে বাইরে এলেন এক বৃদ্ধা । আলুথালু বেশ, মাথায় বরফ পড়েছে । হাতে দুগাছি সোনার চুড়ি ।

বাইরে বরফের পুরু চাদর । গাছপালা সাদা। লোকে বরফের কুচি নিয়ে লোফালুফি খেলছে। বরফদিন ও বরফ রাতে সবাই শীতে কম্পমান ।

ছুট্টে এসে আম্মিকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরলো এক ফোঁটা রায়া ।রায়া রায় । আইনজ্ঞ যশোধরা রায়ের একমাত্র কন্যা । আম্মি অর্থাৎ দিদিমা । দিদিমাকে ও আম্মি বলে । ছোট্ট দুইহাতে জাপটে ধরে আম্মিকে । উনি বছর খানেক হল এই দেশে এসেছেন।

উত্তুরে হাওয়া শুরু , তাই শীতও জাঁকিয়ে বসেছে , চারিদিকে হিম । হিমশীতল, হিমদিন , হিমের সাগর ।

বাগানের কুমড়ো, বেগুন , আলু সমস্ত নিজ হাতে চাষ করা । শীতল বাতাস ও হিমে সব নষ্ট হয়ে যায় । একটু দূরে রায়াদের ফার্ম হাউজ । সেখানে ওর বাবা মিস্টার উত্তম রায় যিনি পেশাগত দিক থেকে টক্সিক কেমিক্যাল ব্যবসায়ী -উনি একটি সবুজ সতেজ অর্গানিক ফার্ম চালান । সেই সবজি বাজারে চালান হয় । গ্রীনরুট নাম সেই ব্যবসার । রায়া ওর আম্মির সাথে যায় খামারবাড়িতে ; পরে ক্ষেতে ।

কি সুন্দর, সবুজ- হরিয়ালি ক্ষেত চারদিকে । কচি কচি সবজি ,চারাগাছ , লাল ও খয়েরি মাটি , ঢালু জমি বেয়ে জল বয়ে চলেছে , খুব ভালো লাগে রায়ার । বিদেশে, শিশুদের নানান প্রকারের খেলনা পাওয়া যায় । ছোট ছোট বাগান করার নকল যন্ত্রপাতি তার মধ্যে একটি । রায়া নকল মাটিতে নকল গাছ লাগায় ।

ওর আম্মি ক্ষেতে চাষ করেন । অবশ্যি রায়া নিজেও ছোটখাটো সবজি ফলায় । তারপর বাড়িতে বাঙালী মতে রান্না হয় । মাঝে মাঝে ফ্যালো ডিয়ার নামে একজাতের হরিণ এসে শস্য লুটেপুটে খায় । অনেকে আবার এই হরিণ মেরে , বাড়িতেই কেটে পিস্ করে নিয়ে তারপর রান্না করে খায় । এই হরিণ খুব আলু খায় তবে রায়ার অবাক লাগে যে আলু না ভেজে বা বেক্ করে না খেয়ে, ফ্যালো ডিয়ার- আলুগুলো ক্ষেত থেকে তুলে কাঁচা খেয়ে নেয় !

আম্মিকে রায়ার খুব ভালোলাগে । আগে আম্মি ছিলেন না । রায়া একা থাকতো । এখন আম্মি সর্বক্ষণের সাথী । স্কুল থেকে আগে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করতো না । এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসে । আম্মি আছেন । বাবা ও মা তো খুবই ব্যস্ত ! ছোট্ট রায়া সময় পায়না যথেষ্ট , বাবা ও মায়ের কাছে কোনো আবদার করার । ওদের সময় একদম টানটান , স্কুলের পিরিয়ডের মতন ।

কাজেই আম্মির সান্নিধ্য লাগে বড়ই ভালো । আম্মি অর্থাৎ কুসুম দাসেরও এখানে ভালোলাগে । যশোধরার স্বামীও ওকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন । বেশ কিছুকাল হল এখানে এসেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির এই দেশকে কেমন আপন করে নিয়েছেন । ওদের মতন স্কার্ট- ব্লাউজ পরেন ।অল্প অল্প ওদের ভাষাও রপ্ত করে নিয়েছেন ।

আম্মি অর্থাৎ কুসুম দাসের গানের গলা খুব ভালো । উচ্চাঙ্গ সংগীতে তুখোড় ।

মাঝে মাঝে বাড়িতে গানের আসর বসে । তানপুরা বাজিয়ে গান করেন । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই রকমই হয় । বাদ্যযন্ত্রটি এনেছেন যশোধরা ওর মায়ের জন্যে , ভারত থেকে । রায়ার আম্মি ।

সেদিন খুব স্নো হল , রাস্তাঘাট বন্ধ । কয়েকটি দূর্ঘটনার কথাও কানে এলো । চারপাশ সফেদ ধূ ধূ , বরফের সাদায় । দু- তিনদিন লাগলো পুরো বরফ সাফ করতে ।

দূরের শহর থেকে এসেছে লাটোয়া আর বেন । তাদের সন্তানদের নিয়ে । লাটোয়া কালো মেয়ে , বেন সাহেব । দুজনেই অধ্যাপনা করে । চারটি সন্তান । দুই সেট যমজ ।

প্রথমে দুই মেয়ে তারপরে দুই ছেলে । যশোধরা মজা করে বলে : টু প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু ফোর । কালো মেয়ে লাটোয়ার মুখখানি ভারি মিষ্টি । মুখে মিস্ট্রি । রহস্য ।

ছেলেপুলেগুলি কুচকুচে কালো , মুখগুলি তবুও কচি ঘাসের মতন উজ্জ্বল । সফেদ নয়ণের মণি মেলে চেয়ে থাকে । যশোধরার বিশাল বাড়িতে এসে ওরা খুব খেলছে , বাগানে লুটোপুটি খাচ্ছে , সদ্য ফোটা ফুলগুলি পটাপট ছিঁড়ছে ।

আম্মি কপট রাগে বলে ওঠেন : অ্যাই ,আমার ফুলগুলো ছিঁড়িস না !

ওরা শুন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে তারপর আম্মিকে জড়িয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে । ওরা আম্মির ধারে কাছে গেলে রায়ার হিংসা হয় ।

হলুদ ফুলের নক্সাকাটা টেবিল ক্লথটি আলতো করে তুলে নেয় কাজের মেয়ে কারমেন । সপ্তাহে তিনদিন কাজ করে । **Concierge Service** থেকে এসেছে । এখানে অবস্থাপন্ন মানুষেরা এই সার্ভিস নেন । মোটা টাকার বিনিময়ে ওরা সমস্ত করে দেন ।

বেবী অন বোর্ড-করে সন্তানদের একলা বিমানে ভ্রমণ করাতে অভ্যস্থ লাটোয়া কাজে সাহায্য করেনা ।

একটু অলস সে । চার চারটি সন্তানের মা , তবুও । ওর বাড়িতে ন্যানিরা সব করে ।

টেবিলের ওপরে একটি পোকা খেকো গাছ ।

নাম ডেয়াড্রিলা , পাতাগুচ্ছ আজব ।

মাছি কিংবা পোকা বসলেই পাতাগুলি মুড়ে যাচ্ছে । পান ভাঁজ করে রাখলে যেমন হয়, সেরকম । পোকার দফারফা ।

বরফের সাথে সবার সখ্যতা হয়না , আম্মি বন্ধুত্ব করে নিয়েছেন ।

লাটোয়া সেই নিয়েই আলোচনাটা শুরু করে , ক্যাজুয়াল টক ।

যশোধরাকে এখানে লোকে বলে : য়্যাশ ।

য়্যাশ সবজি কাটছে , ক্ষেতের টাটকা সবজি । ব্রেকফাস্টে আজ স্যুপ হবে । দিনে অর্থাৎ লাঞ্চ খাবে সবাই মিলে আফগান রেস্তোরাঁ **হবিবি**-তে ।

আম্মি অনেক দূরে , শিশুদের নিয়ে মাতোয়ারা । বাচ্চা খুব ভালোবাসেন । লাটোয়া আলতো মুখ নেড়ে বলে : তোমার মা দারুণ গান করেন আর হাউজ ওয়াইফ হলেও দারুণ চৌকস ।

আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলো যশোধরা , চুপ করে শোনে ।

লাটোয়া একটু বেশি কৌতুহলি , বড় বড় হরিণ চোখ মেলে বলে : উনি একা ছিলেন বুঝি দেশে ?

এবার কথা বলে মৃদু ও মধুরভাষিনী যশো , সাহেবদের য়্যাশ ।

কপালে ছড়িয়ে পড়া নীল চুল সরিয়ে, গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলে ওঠে , উনি আমার মা নন । আমার বান্ধবী চিত্রার মা ।

আমার শৈশব ও কৈশোরের সখী, চিত্রা দাসের মা , আমার মাসিমা । এখন মাসিটা বলি না । শর্টে ডাকি , মা ।

বিস্ফোরিত নেত্রে চেয়ে থাকে লাটোয়া , ক্ষুদে চোখের চার সন্তানের মা !

বাচ্চাগুলি খুব উচ্ছল, প্রাণবন্ত ।

--আর ইউ কিডিং ?

--নট রিয়েলি , সি ইজ মাই ফ্রেন্ডস্ মম ।

শৈশবে, রঙীন পার্কে খেলতে গিয়ে আলাপ আমাদের , পরে এক স্কুলে পড়েছি । মাসিমা কিংবা মা যাই বলো, তখন যুবতী ।দুই মেয়ে । একজন চিত্রা আমার বয়সী , অন্যজন নেত্রা , আরো ছোট ।

ওদের বাবা একজন ব্যাঙ্কার , ওয়েল সেটেল্ড্ ।

ওদের দাদুই আমাদের ওখানে প্রথম মোহরম্ ব্যাঙ্ক চালু করেন ।

ভদ্রলোক ছিলেন ইক্নমিস্ট । মাসিমা , এখন মা- অত্যাচারিত হন ওদের বাবার হাতে । উনি একজন ব্যায়ামবীর ও রোডস্ স্কলার । মাসিমাকে দৈহিক ভাবে আঘাত না করলেও মনটা ভেঙে দেন ।

রূপসী স্টেনো , জুনিয়র কর্মীদের বাড়িতে এনে রাখতেন ।

মাসিমা দুই মেয়েকে নিয়ে একঘরে , অন্যঘরে ঐ ব্যাক্তি নানান বয়সের রূপসী কামিনীর বাহুবন্ধনে । শিশুগুলি দেখে বাবার সাথে মা থাকেন না , নিত্যদিন বাড়িতে নানান মহিলা ।

মাসিমা ঘরে ছাড়েন ।

সেইকালে আমাদের দেশে বিবাহ বিচ্ছেদকে ভালো চোখে দেখা হতনা । ডাইভোর্সী মহিলা অনেকটা বহুভোগ্যা ধরণের। মা তখন দুই শিশুকে নিয়ে বান্ধবীদের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন । গানের গলা সমধুর । বিয়ের আগেই গানে তালিম নেন ।

সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, তবে গানে গোল্ড মেডেলিস্ট । বাড়িতে গান শেখাতেন , তালিম দিতেন ।

অনেক বড় গাইয়ের সাথে আলাপ ছিলো । মেয়ে দুটিকে সুস্থ পরিবেশে বড় করতে লাগলেন । মারোয়ারিদের বাড়িতে টিউশানি করতেন , অনেক পয়সা দিতো তারা ।

এছাড়া একটি ইংরেজি স্কুলে গানের টিচার হলেন ।দুই মেয়ে ওখানে পড়তো , চিত্রা ও নেত্রা । ওদের বাবা বহুবার চেষ্টা করেছেন ওদেরকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে , ওদের মা দেননি ।

বড় মেয়ে চিত্রা প্রতিমাসের শেষে বাবার কাছে যেতো , খোরপোষে টাকা আনতে । পরে দুই মেয়েই গুণী হয় । বড়জন আমেরিকার এক শহরে প্রতিষ্ঠিত ক্যানসার সার্জেন । ছোটমেয়ে সফটওয়্যারে । দুজনই- এন আর আই । অর্থ আছে অঢেল ।

ব্রেকফাস্টের টেবিল সাজিয়ে বসেছে ওরা সবাই । বাইরে এখন রোদ্দুর উঠেছে । অনেকদিন পরে । সবাই খেতে ব্যস্ত । কেউ জুস পান করছেন , স্ট্রবেরি , টমেটো কিংবা পেয়ারার রস , কেউবা বেকড্ আলু ও বিনস্ খাচ্ছে ।

লাটোয়া বলে ওঠে : তারপর ?

রিনরিনে গলায় বলে য়্যাশ : একদিন পুজোর সময় আমি গড়িয়াহাটের ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছি । অষ্টমীর রাত , চারদিকে রোলের দোকান যাকে এখানে বলো র‍্যাপ , আলোর রোশনাই , মানুষের মিছিল ।যেখানে পুজো প্যান্ডেল নেই সেদিকটা ফাঁকা , অন্ধকার । এইরকম এক ফুটপাথ দিয়ে আমি হাঁটছি , এক বৃদ্ধা সহসা আমাকে ধরেন : মা একটা ধূপকাঠি নেবেন ? পুজোতে তো অনেক কিছুই কেনা হয় ! আমি কয়েকদিন খাইনি মা !

পেছন ঘুরে তাকাই মর্মস্পর্শী গলার স্বরে । এক বৃদ্ধা । পরণে পুরনো শাড়ি , হাওয়াই চটি । গলায় তুলসী কাঠের মালা ।

মাসির মুখের গড়ণ ও তুলসী কাঠের মালা যা আগেও পরতেন , দেখে চিনতে পারি কিন্তু বিশ্বাস হয়নি । ইনি যে আমার কুসুম মাসিমা । অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ি---

কুসুম মাসিমা , চিত্রা নেত্রার মা না আপনি ?

মাসিমা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন । হাত ধরে পাশের বেঞ্চে বসাই ।

কথায় কথায় জানতে পারি যে মেয়েরা কেউ দেখেনা ওনাকে, টাকাপয়সাও দেয় না । উনি একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন । আগে বন্ধুদের বাড়িতে থাকতেন ।

দুই মেয়ের পড়ার খরচ জোগাড় করার জন্য আপ্রাণ গাইতেন । পরে ওদের বিয়েও দেন । সমস্ত টাকা শেষ হয়ে যায় । তাই শেষজীবনে ছোট ঘরে ভাড়া থাকেন, ধূপের ব্যবসা ।

ধুপ দেয় স্থানীয় এক মাতব্বর । যত আয় হয় তার সত্তর শতাংশ নিয়ে নেয় ঐ লোকগুলি । কোনক্রমে চলে ওনার ।
আমি ওনার ঘরে যাই ওনার সাথে । এক চালার ঘর ; চারদিকে জঙ্গল । কেরোসিনের বাতি জ্বালান । ইলেকট্রিক নেই । চা বানান কাঠকুটো জ্বালিয়ে । চায়ে কাঠের গন্ধ ।
অনেকটা ট্রেকিং করতে গিয়ে পান করা , চায়ের গন্ধের মতন ! সেই হতদরিদ্র ঘরেও দুই মেয়ের ছবি উজ্জ্বল । বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়া কনিষ্ঠা কন্যা নেত্রা ও বড় মেয়ে - ক্যান্সার চিকিৎসকের উজ্জ্বল বাঁধানো ছবি , অর্থাৎ আমার বান্ধবী চিত্রা । পুরনো অ্যালবাম দেখালেন । চিত্রা পুরস্কার নিচ্ছে , হাসিহাসি মুখে ।
আমি মাসিমাকে ফেলে আসতে পারিনি । মায়ের আঁচল পেতে রেখেছেন এখানে ।

মেয়েদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই ।
বলেন : বাবা মায়েরা সন্তান পালন করেন, তাদের নিন্দে করেন না । ওরা আমাদের আঅজ , বড়ই আপন । ছোটরা ভুল করেই , বড়রা ক্ষমা করে দেন । আর আমার মেয়েরা আজ সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে , ওদের এত সময় কোথায় এই বুড়িকে দেখার ?
গলাটা কি কেঁপে গেলো ? যশোধরা আজও জানেনা ।
মিনিবাসের বিশ্রী হর্ণটা তখন বাজচ্ছিলো , গড়িয়াহাটের অচিনে ।

ওরা সবাই আজ ওদের ফার্মহাউজে । পাশেই ডার্লিং ক্রিক । বিশাল নদী । এখানে ধানক্ষেত আছে , বড় বড় জায়গা জুড়ে আস্তাবল । টক্সিক কেমিক্যালের ব্যবসাদার, য়্যাশের স্বামী উত্তম এখানে অর্গানিক ক্ষেত চালান । দূরে নীল ও বেগুনি পাহাড় , সবুজ ক্ষেত , সাদা ও ধূসর গাছ আর অনেক বাদামী ও কালো ঘোড়া ।

কুসুম দাসের খুবই ভালোলাগে এখানে । ধানের ঝাড়াবাছা দেখেন । আগে বাড়িতে সেলাই ফোঁড়াই করে বিক্রি করতেন , খুবই চোস্ত হাতের কাজ । নানান মেশিনে বোনেন - সেলাই বুনন , ফার্মার্স মার্কেটে বিক্রি করেন সপ্তাহে একদিন করে । ওখানে চাষীরা সবজি , নানান হাতের কাজ , নিডিল ওয়ার্ক , পুরনো যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার করা নানান দ্রব্য বিকিকিনির জন্য বসে- সবুজ হাটেবাটে । পসরা সাজিয়ে বসেন কুসুম দাস । চোখের পাওয়ার কমেনি । গানের গলাটা কেবল বসে গেছে । কাউকে শেখাতে পারবেন না আর তবে নিজ মনে গান করেন ।

অনেক চাষী নিজ ফার্ম থেকে গরুর দুধ দুইয়ে আনে । কুসুম দাস সেই দুগ্ধপান করেন । র-মিল্ক বলে এখানে । দুই কৃতী কন্যার জননী কুসুম দাস ভালো আছেন । ভালো আছেন যশোধরার আঁচলে । আরেকটি সন্তান হয়ে ।

বাইরে হিমঝরা ক্ষণ। ঘরের অন্দরে ওম্ ওম্ আলো।
তবে বরফেও বসন্ত আসে , শ্বেতকপোতের দেশে ওড়ে রঙীন প্রজাপতি , আজও , আপন মনে।

হোলি

ডল ত্রুসত্রুপ বিয়ে করেছেন ত্র্যম্বক সেনকে । এই জটিল নামখানি সাহেবেরা ডাকতে অক্ষম তাই উনি এখন র‍্যাটান । অর্থাৎ রতন । রতন হেসে বলেন : বাবা জানতো না আমি পরবাসী হবো তাই এই কমপ্লেক্স নামটি দেন । আমি নামখানি সহজ করে নিলাম , রতন অর্থাৎ জুয়েল । রত্ন । হীরে না পান্না তোমরাই বিচার করো । আমি কিন্তু রটেন নই একদমই !

দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়তেন , ডল ও র‍্যাটান ।

রতন বলতেন : আমাদের সন্তান তা ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন আমরা নাম দেবো হোলি । অর্থাৎ পবিত্র । জুয়েল ও ডলের মিলনে যা হবে তা আনহোলি তো নয় , কখনই !

ছোট্ট হোলি যেদিন জন্মালো সেদিন সত্যি দোলপূর্ণিমা । আকাশ ভাঙা জ্যোৎস্না । থৈ থৈ জোছনা । বসন্ত উৎসব ।

রতন বলেন : আজ আমাদের দেশে দোলপূর্ণিমা । হোলি , রং এর ফাগুন । রাধাকৃষ্ণ হোলি খেলতেন । আমার মেয়েকেও আমি হোলি খেলতে শেখাবো ।

মেয়ে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো । মেম মাতা ও ভারতীয় পিতা । রতন মেয়েকে দেশে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন । রাজস্থানের দিকে গিয়ে হোলি খেললো সে । বাড়ি ফিরলো সারা শরীরে এলার্জি নিয়ে । রং-এর উল্লাসে হারিয়ে ফেললো নিজেকে ।

চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হল । প্রাণবন্ত মেয়েটি ছুটে ছুটে খেলছিলো , আবীর দিয়ে । এক অস্বস্তিকর রোগের কবলে পড়ে হঠাৎ-ই খুব মুষড়ে পড়লো সে ।

চিকিৎসক বিধান দিলেন : হোলিতে রং ব্যবহার করা চলবে না ।

ডল ও রতন ওকে ফুল দিয়ে হোলি খেলতে শেখালেন । ফুলের রাশি রাশি পাপড়ি দিয়ে হোলি । কিন্তু আমাদের কিশোরী হোলির তাতে একটু মন মজতো না । বলতো : হোলিতে গায়ে রং না মাখলে ভালোলাগে না !

সেদিন হিমমাস । ভালই ঠান্ডা পড়েছে । পাশের বাড়িতে থাকেন হেম হেমব্রম । ভারত থেকে এসেছেন কিন্তু আদিবাসী বলে রতন মেয়েকে ওখানে যেতে দিতেন না । ডল অবশ্য বাধা দিতেন না । হেম হেমব্রম খুবই প্রতিষ্ঠিত । উনি একজন পশু চিকিৎসক ।

দেশে থাকতে বহুভাবে প্রতাড়িত হচ্ছেন দেখে ওর মাস্টার মহাশয় ওকে এখানে পাঠিয়ে দেন । আদিবাসী বলে, লোকে আগেই হেয় করতো । তার ওপরে গরুভেড়ার ডাক্তার হতে চান । গোদের ওপরে বিষফোঁড়া ।

---এটা কোনো লাইন হল ? গরু, ভেড়াকে মেরে ফেললেই তো হয় ! চিকিৎসার নাম করে এত খরচ ! যত্তসব ন্যাকামি । যেই দেশে লোকে খেতে পায়না সেখানে--- তুই নিজে কি খেতে পেতিস্ ? হোগলার ঘরে তো থাকতিস্, মনে নেই ?

এইসব অপমান সয়ে সয়ে হেমের মনে হত- ওর ভেতরে যে সম্ভাবনা আছে তা অকালে ঝরে যাবে ! তখন ওর প্রফেসর ডঃ ভারত ইন্দু সাহা ওকে এখানে পাঠান ।

হেম হেমব্রম বিদেশে এসে দেখেন যে এখানে পশুরা কত সম্মান পায় ! ওরা আমাদেরই মতন । পোষা জন্তুরা তো রকমারি খানা খেতে অভ্যস্থ । সাতদিনের জন্য সাতরকম প্যাকেটে, খাবার বিক্রি হয় বড় বড় শপিং মলে শুধু ওদেরই জন্যে ,

আলাদা বিভাগে । ওদের কত যত্ন করে বিদেশীরা , নখ ও লোম ছাঁটার সেলুন আছে ওদের জন্য । ওদের দাঁত মেজে দেওয়া হয় !

ডঃ সাহা বলেছিলেন বটে:বিদেশে যাও নিজের লাইফের ডায়মেনশান চেঞ্জ হয়ে যাবে । জীবনকে , নিজের অস্তিত্বকে ছুঁতে শিখবে । নিজেকে একজন পূর্ণমানুষ , পূর্ণকুম্ভ মনে হবে ।

হেম হেমব্রম এখানে পশু চিকিৎসায় অনেক নতুন তত্ত্ব ও পরিবর্তন এনেছেন । মানুষ ওকে খুব সমীহ করে । কেবল অনেক ভারতীয় মেশে না । উনি আদিবাসী বলে । ট্রাইবাল কমিউনিটি , অসভ্য , আদিম গুহামানব ! ঘরোয়া পার্টিতে ভারতীয়রা ওকে ব্যঙ্গ করে : হেম হেমব্রম হাঁটে গোরিলার মতন , সামনের দিকে ঝুঁকে আর ছাড়ে হুংকার -----বলেই মদের পেয়ালা হাতে হেসে ওঠে শহুরে বাবুবিবিরা। কেউ ফাটা প্যান্ট পরে কারো বা পরণে অত্যাধুনিক লেংটি ।

কাম অন বেব, আফটার অল টুডে আ জাংলি গরিল্লা ইজ এমং আস, কিং কং --টি টং---উই ডোন্ট হ্যাভ টু গো টু দা জু !

হা হা হো হো ! লেংটির শুদ্ধতা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে অসর্তক মূহুর্ত । অশালীনতা লেপটে আছে সভ্য মানবের সমস্ত দেহে !

হেম বিয়ে করেন নি । ওর বাড়িটা পশুশালার মতন । হোলির বাবা ব্যাগড়া দিলেও মা ডল আপত্তি করেন না তাই হোলি প্রায়ই ওখানে চলে যায় । হেম হেমব্রম একজন সহপাঠিনীকে ভালোবেসেছিলেন , ব্রাহ্মণ । কেয়া মুখোপাধ্যায় নাম তার ।

উচ্চজাতের নারী আর তার প্রাণপুরুষ দলিত । পাত্র ব্রাত্য সভ্য সমাজে । তাই মাঙ্গলিক কিছুই হলনা । দয়িতার ফটোতে , নাকে নাক ঘষতেন । একলা ঘরে লোভী পুরুষের এইটুকুই সম্বল । এইভাবেই ভুলে থাকতেন সব ।

কেয়া ঝরে গেলো । কেয়া তার জীবনে আর নেই । হেম হেমব্রমও হঠাৎ বুড়িয়ে গেলেন ।

এখন পশুশালায় অষ্টপ্রহর , তবুও জীবনটা তেতো লাগতো ।

পাকাচুল , ঈষৎ মেদবহুল দেহ -এই জ্ঞানী ও পন্ডিত- কিশোরী হোলিকে খুবই স্নেহ করতেন ।

ডলের বোন রুথও খুব যেতো ওখানে । ফিরে এসে বলতো , উনি খুবই নম্র ও বিদ্বান । দরদী মন ওনার । র‍্যাটান ওকে পছন্দ করে না কেন রে ?

ডল ও হোলি প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় । রুথ বুঝতেই পারেনা যে একজন মানুষের জাতের সাথে তার মনুষ্যত্বের কি সম্পর্ক থাকতে পারে !

হোলির খুব মন খারাপ আজ কদিন । সামনেই হোলি । হিন্দু মন্দিরে রং খেলা হয় । ন্যাড়াপোড়া হয় । বিষ্ণু মন্দির । মাধব, মদনমোহনের মুখখানি ভারি মিষ্টি । পাশে শ্রীরাধিকা ,মাধবীরাতে মাধবের সাথে নিবিড় গুঞ্জনে ।

--- হোলি যার নাম সে খেলবে না হোলি ? সো স্যাড !

ওকে ক্ষেপাচ্ছিলো ওর বন্ধুরা ।

ওর বেশিরভাগ বন্ধুই ভারতীয় । ওরা উচ্চজাত , কূলশীল দেখে তবেই মেশে । ওর বাবার কড়া নিয়ম এগুলি ।

ট্রাইবাল মানুষ কিংবা অ্যাফ্রিকানদের ছায়া মাড়ানো পর্যন্ত পাপ । সাহেব হলে অসুবিধে নেই । তাই বুঝি ওর মা -মেম ।

হেম হেমব্রম আর ভারতে যাননা । মাতৃভূমি ওকে অনেক আঘাত দিয়েছে । কে যেন বলেছিলো একবার , ওকে --- বিদেশে যাচ্ছো ভালো কিন্তু দেশ ছেড়ে গেলেও- দেশ , তোমায় ছাড়বে না !

হেম হেসেছিলেন ।

ওনার প্রেম, পেশা ও পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে যেই ভূমি তাকে কি দেশ বলা যায় ? দেশ মানে তো মা , মাটি । সেখানে এত ভেদাভেদ ওনার ভালোলাগেনা ।

দেশ যেন ওকে বলে : ওরে ছোটলোক তুই তো পশুরও অধম । পশু চিকিৎসক হয়ে হবেটা কী ?

রিজেকশান , রিজেকশান, রিজেকশান , সব ফ্রন্টে বিদ্রুপ , ব্যঙ্গ । অবহেলা , বিষণ্নতা । তাই মাতৃভূমিকে ঘৃণা না করলেও ; উনি ওখানে আর যাননা । ভারতমাতা ওর কাছে বিষাদকন্যা , পাষাণ প্রতিমা । যবে থেকে এসেছেন , এখানেই থিতু হয়েছেন । ছেঁড়াখোড়া মানুষটি এখন ভরে উঠেছেন । পরবাস তাকে অনেক দিয়েছে।

যশ , সম্মান , স্বীকৃতি ।

হোলিকে খুব বকলেন ,---বললেন -- যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে এত ভাবো যে তোমার জীবন ছারখার হয়ে যাচ্ছে । জীবনে অনেকগুলি জানালা খোলা রাখবে । তাহলে দেখবে একটি বন্ধ হলেও অন্যগুলি দিয়ে তাজা বাতাস আসছে ।

সত্যি হোলি চোকড্ হয়ে গেছে । ওর রং খেলতে না পারার দু:খ যেন সবকিছুকে ঢেকে দিয়েছে । কিছুই আর ভালোলাগেনা । মন বসেনা কাজে , পড়ায় ।

গাছের লালচে পাতার ফাঁক দিয়ে সোনা গলা রোদ । সোনার কাঁকন পরা মেয়ে হোলি, কচি লেবুপাতা রোদে পা ডুবিয়ে ভেসে চলেছে হেম হেমব্রমের বাড়ি অভিমুখে ।

হেমসাহেব নেই । কোথায় গেছেন কেউ জানেনা । বাড়ি ফাঁকা । পশুদের দেখভালের জন্য অবশ্যই মানুষ আছে । তারা অন্যদিকে । তারা জানেনা কিছু , কিছু বলে যাননি ।

এদিকে মালেশিয়ায় হল প্লেন ক্র্যাশ । ডল ও হোলি খুব চিন্তিত ।

বারবার যাত্রীদের লিস্ট চেক করছে ওরা । হোলির বাবা রতন ওরফে ত্র্যম্বক সেনও বললেন : ভদ্রলোক কি উবে গেলেন নাকি কর্পূরের মতন ? কেউ কিছুই জানেনা -কতদিন হয়ে গেলো , আমার মনে হয় পুলিশে জানানো উচিৎ !

পুলিশে খবর দেবার আগেই উনি সশরীরে হাজির । ধূমকেতুর মতন । পোষ্য পশুরা বিগলিত । পক্‌ক কেশ , ভারতদুখী মানুষটি দু-হাত ভরে শুধুই আবীর এনেছেন হোলির জন্য । সুদূর মাতৃভূমি থেকে । ওখানে এক উপজাতি এই আবীর তৈরি করে । ফুল ও ফল থেকে বানানো এই আবীর দিয়ে হোলি খেলে -রাইকিশোরী ।

পলাশ ফুল ও নানান খনিজ পাথর যা হিলিং স্টোন বলে পরিচিত তা গুঁড়ো করে এই আবীর তৈরি হয় । ওদের এই আবীর বিষমুক্ত । রসায়ন নেই , সবই প্রাকৃত । আলো আছে আগুন নেই , সৌরভ আছে উগ্রতা নেই । ঝাঁঝ নেই । চামড়ার জন্য উপকারি এই রং ।

এক পশুবিজ্ঞানীর হাত ধরে হোলির কাছে পৌঁছে গেছে এই রংয়ের খনি । হোলির মুঠিতে আজ শুধুই সাতরঙা রামধনু । স্পেকট্রামের মাধুরী । ক্রিমসন হোলি , টিল হোলি , অরেঞ্জ হোলি , স্বর্ণালী হোলি, হোলি মধুবন।

ওড়না

বছর পাঁচেক হল মোম অস্ট্রেলিয়াতে এসেছে।

কাজ করে শেফ হিসেবে বড় হোটেলে। রাতবিরেতে কাজ করতে হয়। ঘুমের দফারফা। আরাম প্রিয় বাঙালীর বেজায় মুস্কিল হল। শেষকালে অনেক ভেবেচিন্তে ও একটি রেস্তোরাঁতে কাজ নিলো। মালিক এক পাঞ্জাবী বৃদ্ধা। নাম অমৃতা। সবাই অমৃতাজী বলে ডাকে। মোম ওরফে মোম বসু ওকে ডাকে নানী বলে। ভদ্রমহিলার হৃষ্টপুষ্ট গড়ণ। নাক মুখ সুন্দর। লম্বা পাকা চুল। মোটা বেণী।

মোমকে খুবই স্নেহ করতেন। করতেন কারণ উনি আর জীবিত নেই। গত পরশু বয়সের কারণে মারা গেছেন। এখানে এখন হেমন্ত। হেমন্তের বিষণ্নতা চারিদিকে।

পাহাড়ে যখন তখন কুয়াশা, পাইন পাতায় মেঘের আলতো ছোঁয়া। রৌদ্রছায়ার খেলা নেই। কেমন ধূসর বিহ্বলতা। নানী, অমৃতাজী অথবা অ্যামি যাই বলো না কেন উনি আর মূলতান

(হাউজ) গেট রেস্তোরাঁর মোটা লাল গদিতে বসে -মানুষকে অভ্যর্থনা জানাবেন না ,কোনোদিন-ই । কারণ উনি নিভে গেছেন ।

একটি মোটা মোমদানিতে সুন্দর মোমশিখা ছিলো । সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে উনি বলতেন : একদিন ঠিক এই মোমটার মতন, আমি ফুরিয়ে যাবো , নিভে যাবো ।

এমনিতে উনি ছিলেন খুবই মিশুকে। লোকজনের সাথে হেসে হেসে , দুলে দুলে কথা বলতেন । লম্বা বেণী দুলিয়ে সবাইকে কাছে ডাকতেন । রেস্তোরাঁর কিচেনে সবাই যেতে পারেন । নানী সবাইকে রেসিপি বলেন । পরে শুধালে বলেন : অনেস্ট বিজনেস ওম্যানরা এইভাবেই ক্রেতাদের মন জয় করেন ।

লম্বা চুল দুলিয়ে কাজে আসতেন । নিজে হাতে সাফাই-ও করতেন । ফিশ বিরিয়ানি ,তন্দুরি গোট নিজ হস্তে **পাকাতেন** । প্রতিটি ফুলকপি এক সাইজে কাটতেন । এই ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন । ঝিরিঝিরি করে লাউয়ের খোসা কেটে তা কালোজিরে সহযোগে ভাজা , মোমের কাছে শিখেছিলেন । পরে মূলতান হাউজে ঐ খানা মিলতো । নাম দিয়েছিলেন : লাউকি শেল ফ্রাই ।

সাহেবরা পর্যন্ত গ্রোগ্রাসে খেতো ।

বাঙালীরা খায় ভালো , খুব ভালো । নানী প্রায়ই বলতেন ।

মূলত পাঞ্জাবী হলেও দেশবিভাগের সময় ওর পরিবারের বহু মানুষ পাকিস্তানে চলে যান । মূলতানের দিকে । উনি যেতে পারেন নি । ওর বাবা এদিকে রয়ে যান । সেই দু:খ ভুলতে হোটেল খোলেন মূলতান হাউজ নাম দিয়ে ।

কতনা বন্ধুবান্ধব , স্বজন পরিজন ওদিকে চলে গেছেন !

দেশভাগের সময় ওর পরিবারের সদস্যগণ পালাচ্ছিলেন । যেই ট্রেনে ওরা ছিলেন তা আক্রান্ত হয় । ভিন্নধর্মীরা, আগের কামরা পর্যন্ত সবাইকে কোতল করে । ওর আত্মীয়রা বেঁচে যান । এই গল্প সবাইকে বলতেন ।

সাহেব ভোজন রসিকেরা শুধাতেন : তোমরা প্রতিবেশী , এত হানাহানি করো কেন ? কেনই বা এত ভায়োলেন্স ? ভারত পাকিস্তানের সীমান্তে দাঁড়িয়ে বলো : আমরা পিস (শান্তি) চাই , পিস (টুকরো) নয় !

নানী তখন মুখটা গোমড়া করে ফেলতেন । ওড়ানার ঝাপ্টা মেরে মিহি বাতাসে , বলে উঠতেন : ওসব রাজনীতির খেলা । সাধারণ মানুষ এগুলি সবই বোঝে ও জানে ।

নানী রেগে গেলে ওড়না দোলাতেন । সালোয়ার কামিজ অথবা পশ্চিমী পোশাক যাই পরুন না কেন , ওড়নাখানি সবসময় গলায় ও মাথায় ছড়িয়ে দিতেন যেমন প্রকৃতি পাহাড়ে , সাগরে, মেলায় আলতো করে সোনালী আলো বিছিয়ে রাখে ।

নানী ওড়না কখনো হাতছাড়া করতেন না । বলতেন : এ আমার সহচরী , আমার সাথে কফিনে যাবে !

বহু ওড়না ছিলো তাঁর । মোমের সবথেকে ভালোলাগতো বাসন্তী কালারের অপরূপ কারুকার্য করা রেশমের ওড়নাখানি । এছাড়া ন্যুড কালারের ওড়নাও ছিলো । উনি একে বলতেন : টি কালার ।

চোখ জুড়ানো, মনমাতানো ওড়নাগুলি সাহেব মেমরাও- ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতো ।

--অ্যামেজিং , ওয়ান্ডারফুল, ফ্যান্টাস্টিক ----!!

রেশমী ওড়নাখানি একবার হারিয়ে যায় । মোম, তার জন্য নিজেকে দায়ী করতো । আসলে নানী ওকে নিয়ে এক গুরুদ্বয়ারায় লঙ্গর খেতে যান । উনি প্রায়ই খেতেন । সারাদিন লঙ্গর হয় । যাও আর থালা , বাটি নিয়ে বসে পড়ো । খিচুরি , নানান উপাদেয় সবজি আর এক মুখরোচক হালুয়া দেয় । অনেক ছাত্রছাত্রী যারা এখানে পড়তে আসে, তারা ওখানে ফ্রিতে খানা খায় ও কাজ করে । পরে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত

হয়ে গেলে, ওরা ওখানে নিজেদের খরচে লঙ্গর দেয় অর্থাৎ একদিনের মহাভোজ স্পনসর করে ।

নানীর নানী নাকি প্রায়ই লঙ্গর দিতেন । মানে স্পনসর করতেন । সেই লঙ্গর ভারতে হত । অমৃতাজী এখানে কোনোদিন লঙ্গর দেননি । লোকে বলে উনি কৃপণ । ব্যবহার ভালো , মিষ্টি কথামালা কিন্তু মনটা আড়ষ্ট । লোকে বলতো । লোকের কথা । কথামৃত , অমৃতার কথা ।

কেউ পার্টিতে, ক্যাটারিং এর জন্য ডাকলে নানী পুরো পেমেন্ট আগেই নিয়ে নিতেন । সামান্য নুন ,লেবু ও জলের দামও নিতেন ।

বাগানের ঝাল লঙ্কা তুলে এনে বিক্রি করতেন হোটেলে । কেউ খানা ফেলে চলে যেতে চাইলে তা টেক -এওয়ে করতেই হত নাহলে নানী কোনোদিন আর তার মুখদর্শন করতেন না । মোমের খুবই মজা লাগতো ।

নানীর এতবড় ব্যবসা উনি নিজেই গড়েছেন । মোট চারটে হোটেল । অর্থাৎ রেস্তোরাঁ ও বার । সব ওনার নিজ হাতে গড়া । পাঞ্জাবী হলেও এসেছেন পাটনা শহর থেকে ।

ওর পতিদেব ওখানে কাজ করতেন । নিজ গ্যারাজ ছিলো । সংলগ্ন ধাবা । নানী -তিন সন্তানসহ ওখানে ছিলেন । ১৯৮৪

সালের দাঙ্গায় নিজ স্বামীকে হারান । ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পরে যে দাঙ্গা, তাতেই গুলশন সিং মারা যান ।

নানী তো এখানে কৃপণ বলে পরিচিতা । নিজ নাতিনাতনির বেলায়ও বেশ কড়া । বেবী সিটিং করলে অর্থ দাবি করেন, নিজ কন্যাদ্বয়ের কাছে । কেউ ওর বাসায় এসে জামাকাপড় ওয়াশিং মেশিনে কাচলে, তাকে মাসের শেষে একটি বিল পাঠিয়ে দেন ।

নানীর দুই মেয়ে এখানে । একজন হোটেলেই কর্মরতা, অন্যজন একটি বৃদ্ধাবাসে কাজ করে । ম্যানেজার হিসেবে । নানীর একমাত্র পুত্র আছে পাটনায় । ঐ ধাবা চালায় আর গ্যারাজ ।

এখানে নানান উৎসবে নানী খোলের মতন এক বাদ্যযন্ত্র বাজান । এর জন্য কেউ অর্থ নেন না কারণ কমিউনিটির জন্য বাজান ওরা ।

বলেন : গুরুসাহেব তো পেট ভরে খেতে দেন । আমরা দশ টাকা আয় করলে পাঁচ টাকা দান করি । কাজেই এই বাজনার জন্য টাকা নেবো কেন ?

নানী ভিন্নমতের মানুষ । উনি বলেন : আমার হোটেলের কাজ ফেলে আমি বাজাতে এসেছি- কাজেই আমি চার্জ করবই ।

অনেকে বলেন : স্বামীর নিহত হওয়া নিয়ে হয়ত মনে ক্ষোভ আছে । তাই সবার কাছ থেকে টাকা উশুল করে নিতে চান ।

রেস্তোরাঁ কর্মী হবার পূর্বে মোম ছিলো এক সাধারণ খদ্দের । নানীর সুমধুর ব্যবহারে আজ সে তাঁর কাছের মানুষ । তবুও আজ পর্যন্ত ওর একটিও ফ্রি লাঞ্চ জোটেনি এই হোটেলে ।

নানীর হিসেব পাকা । ফেলো কড়ি মাখো তেল ।

তবে কথায় দরিদ্র কদাচ নয় । এক বর্ষণমন্দ্রিত ক্ষণে বলেন : জানিস বেটি মোমুয়া -ওকে তো মেরে ফেললো বিহারীরা । অপরাধ ? ইন্দিরা গান্ধীর নিধন । আমরা কী করবো ? সব শিখ কি মন্দ ?

ওরা চীৎকার করছিলো : তোরা ধর্মস্থানে আগ্নেয়াস্ত্র রাখিস । সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিস ।

আমাদের ধর্মে অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার স্বীকৃত । এগুলি ধর্মস্থানে থাকেও ।

কিন্তু সন্ত্রাসবাদের সাথে আমার স্বামীর কী সম্পর্ক ? ওকে কুপিয়ে ফেললো । আমার সামনেই কচুকাটা করলো ।

সেই দৃশ্য ---- কথা শেষ হয়না --হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন ।

নানী এবার অকৃপণ । চোখে জলের ধারা । বরষা । চোখের জলে কোনো কৃপণতা নেই । মোম ওকে শান্ত করার চেষ্টা করে । নানী হাউ হাউ করে কাঁদছেন , বাঁধনহারা জলস্রোত গাল বেয়ে ওড়নায় নিমজ্জিত হচ্ছে । নানী এবার যন্ত্র থেকে মানবে ।

সেই নানী আর নেই । মোটা , লম্বা বেণী , সদা হাস্যময়ী এক ঝাঁক লাস্যময়ীর মাঝে । কাঁদার কথা আজ মোমের । ওর রেস্তোরাঁর বাঙালী , রন্ধন পটিয়সী, গোধূমবর্ণা মেয়েটির ।

কারণ ফিউনেরালে গিয়েও ওকে শেষ দেখার সুযোগ পায়নি । ওড়নাগুলি নাকি অক্ষত ও অটুট । কফিন বন্দী নয় ! কিন্তু মোমের মতন অনেকেই আজ কাঁদার বদলে হাসছে ।

নানীর শেষকৃত্য হয়নি । কারণ ওঁর দেহটাই যে নেই !

তা দান করা হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ।

তারারা আকাশে উজ্জ্বল । মোমবাতি ঘেরা প্রতিটি রাত্রি মায়াবী !শুধু নানী বদলে গেছেন । অমৃত হল অমৃতার নশ্বর দেহ ।

--আস্ত একটা বডি উনি দিয়ে যাবেন, কেউ কি ভেবেছিলো ? বলে ওঠে সাফাই কর্মী মনজিৎ ।

-নাহ্ ! উনি সত্যি কিছুই ফেলেন না ! বলে আরেক কর্মী , ভাগ্যশ্রী ।

বিদেশে বহু মানুষ স্বেচ্ছায় দেহদান করেন ও ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নেন সমাজের উপকারের জন্যই ।

অমৃতাজীর ওড়নাগুলি নানান আকৃতির পুতুল করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওর নানান রেস্তোরাঁয় , এও ছিলো তাঁর শেষ ইচ্ছা !

ইন্‌সেন

বহুদিন আগে হিমালয়ের এক প্রদেশে বাস করতেন এক ব্রাহ্মণ পূজারী । উনি খুবই সৎ ও কর্মঠ ছিলেন তাই সমাজে খ্যাতি ভালই ছিলো । ওঁর পুজো নিঁখুত । মন্ত্রোচ্চারণ নির্ভুল । গমগমে গলায় সংস্কৃত মন্ত্র শুনে মনে হত স্বয়ং দেবতারা নেমে আসবেন আকাশ থেকে ।

ব্রাহ্মণের নাম সুরপাণি । ওদের জাতের মধ্যে খুবই উচ্চশ্রেনীর ব্রাহ্মণ উনি । একমাত্র পুত্র জয়শীল । স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে সুখের সংসার । অবসরে এই পুরোহিত দাবা খেলতেন ও

ভারত্তোলন করতেন । ওদের স্টেট লেভেল -এ উনি ওয়েট লিফটিং বিভাগে পদক পান । খুবই ডায়নামিক--- লোকে বলতো ।

কাছেই শৈল শহর দার্জিলিং । বহু মানুষের বসবাস ওখানে । ধরা যাক এই পুরোহিতের দেশের নাম শৈলকুঞ্জ । এই শহরে মানুষের সুখ, মাপা হত । আনন্দের পরিমাপ করা হত এবং তা বেশ ভালো । মানুষের জীবন যাপনের ধারা ও সমাজের উন্নতি --দুটি নিয়ে এই আনন্দ পরিমাপ । হিমালয়ের পরিচিত দেশ ভূটান থেকে ওরা এই পদ্ধতি আমদানি করেছিলো । অর্থাৎ মানুষ খুবই সুখী এখানে । ক্রাইম নেই । আদালত একটি ক্ষুদ্র ঘর কারণ ক্রিমিন্যালের অভাবে আদালত বন্ধই থাকে বেশির ভাগ সময় ।

সবাই সুখী ও খুশি কেবল একটি বিষয় খুব দৃষ্টি কটু লাগতো বলবান পুরোহিত সুরপাণির ।

এখানে পুজোর সময় কুমারী পুজোর নামে কচি কচি মেয়েদের ধরে রেখে অত্যাচার করা হত । দৈহিক অত্যাচার হয়ত নয় কিন্তু সদ্য কিশোরীদের নানান বিধিনিষেধে বেঁধে রাখা ও শারীরিক কষ্ট দেওয়া এগুলি ভালোলাগতো না সুরপাণির ।

উনি বলতেন : আমরা তো মূর্তি পুজো করি । খামোখা এদের টানা কেন ? ওদের কত কষ্ট হয় !

কিন্তু এই শৈলকুঞ্জ প্রদেশে মানুষ জীবন্ত দেবী বেশি পছন্দ করে , প্রতিমার বদলে । তাই পুরোহিতের কথায় কেউই তেমন কর্ণপাত করেনি । এরপরের ঘটনা গতানুগতিক ।

পুরোহিত, প্রতিবাদ করেন জোরালো স্বরে , পুঁথিপত্র দেখান যে জীবন্ত মেয়েদের এরকম করে ধরে এনে কুমারী পুজো করা অনুচিত । শাস্ত্রে আছে যে জীব জ্ঞানে শিব পুজো ভালো , অতি উত্তম কিন্তু তার মানে দান ধ্যান ও নিরন্নে অন্ন দেওয়া । এইভাবে মেয়েদের ওপরে অত্যাচার নয় ।

পূজারী বরখাস্ত হন । কিছুদিন পরে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন । এই আততায়ী মনে হয় বহিরাগত । মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছিলো ।

ওর স্ত্রী রেণুকা দেবী একমাত্র সন্তান জয়শীলকে নিয়ে ভয়ে পালিয়ে যান দার্জিলিং শহরে এক শুভানুধ্যায়ীর সাথে ।

দার্জিলং শহরে একটি বড় কলেজে রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন ধুর্জটি পালিত । উনি সুদূর কলকাতা শহর থেকে চাকরি নিয়ে এখানে আসেন । পাহাড় ভালোবাসেন বলে ।

প্রফেসর নি:সন্তান । ওর গৃহে আশ্রয় পান রেণুকা । জয়শীলকে প্রফেসর নিজ সন্তানের মতন পালন পোষণ করতে আরম্ভ করেন । ওর স্ত্রী নন্দিতা পালিত একজন চিকিৎসক । চেম্বার সেরে এসে জয়শীলকে পড়াতেন উনি । অবসরে প্রফেসর পালিত-ও ।

দেখেছিলেন কী অসম্ভব মেধা ওর । বিশেষ করে ইনোভেশানের দিকে খুব ঝোঁক । ঝটপট আইডিয়া ওর মাথায় এসে যায় । আজকাল তো কম্পিউটারের যুগ ! ওর সফটওয়্যারের দিকটাই বেশি ভালোলাগতো ।

মা ও ব্যাটা - রেণুকা ও জয়শীল নতুন জীবন শুরু করলো ।

সেদিন রবিবার । প্রাত:রাশের ভালো খাবার হয়েছে । এই দাতা প্রফেসর প্রতি রবিবার নিজ গৃহে ভোজনের আয়োজন করতেন এবং বহু নিরন্নে অন্ন বিলাতেন । আজও সেরকম ব্যবস্থা ।

আজ এসেছেন বিদেশী এক বন্ধু । ক্রেগ লাইকিং নাম তার । বিদেশে গবেষক । প্রফেসর ডক্টরেট করার সময় থেকে এর সাথে বন্ধুত্ব । পালিত সাহেব তখন ইংল্যান্ডে ।

ক্রেগ বললেন : জয়কে বিদেশে পাঠিয়ে দাও । ওখানে ইনোভেশানের অনেক সুযোগ পাবে ও । এখানে এত নেপোটিজম , করাপশান , এখানে উচ্চশিক্ষা নিয়ে কী হবে ?

কথাটা মনে ধরলো পালিতের । এবং স্থির হল ওকে বিদেশে পাঠানো হবে ।

যথাসময়ে ছেলেটি উচ্চমাধ্যমিক দিলো এবং খুব ভালো ফল করলো । ওর মা রেণুকার স্বপ্ন ,ছেলে বিদেশে যাক । যেহেতু প্রফেসর পালিতকেই ব্যবস্থা করতে হবে তাই চুপ করে

ছিলেন । একে তো সন্তানসহ এদের কাছে উঠেছেন যদিও উনি ওদের সংসারের সমস্ত ভার নিয়েছেন তবুও নিজের ছেলের জন্যে বলতে সংকোচ হয় ।

একদিন ডিনার টেবিলে গরম গরম লুচি ও আলুর ঝাল ঝাল শুকনো দম খেতে খেতে প্রফুল্ল চিত্তে পালিত বলেন : আমি সব ব্যবস্থা করে এলাম । পরশু কলকাতায় যাবো । ওকে এবার বিদেশে পাঠানো হবে ।

মুখে হাসিরেখা এসে মিহি ভাবে ছড়িয়ে গেলো সারা চেতনায়, রেণুকার । এই মূহুর্তের অপেক্ষায় ছিল যে !

জয়শীলও ভারি খুশি । তারও স্বপ্ন বিদেশে গিয়ে নানান কারিগরি দক্ষতা দেখিয়ে পেটেন্ট করা । এখানে সুযোগের খুব অভাব । সহজে লোকে চান্স দেয়না । দার্জিলিং এর খাদে নেমে শেষ আনন্দের রেশটুকু শুষে নিলো জয় । পাহাড়ি বন্ধু রূপরাজ তামাং এর সাথে খুব হাসি তামাশা হল । এ শুধু তার জয় নয় , ওর মা রেণুকা ও বাবা সুরপাণিরও -জয় । তারাই ওকে স্বাধীন চিন্তা করতে শিখিয়েছেন , শিখিয়েছেন প্রশ্ন করতে । বস্তাপচা নিয়ম কানুন ও প্রথাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে ।

মেয়েদের সম্মান দিতে ও ধর্মের নামে অনাচার না করতে ।

সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপরে । মেয়েদের চেপে রেখে সমাজ এগোয় না । থমকে যায় । ওদের

উপযুক্ত সম্মান দেওয়া বাঞ্ছনীয় । আজকাল বহু পুরুষই তা দেন ।

কলকাতা যাবার পথে এইসব আবোল তাবোল ভাবছিলো ট্রেনে বসে । মা ও কাকি অর্থাৎ যাকে ও বলে কোকোমা , তিনি অনেক শুকনো খাবার দিয়েছেন খাবার জন্য । ট্রেনে । ও তার পরে ।

যথাসময় ওরা কলকাতা পৌঁছায় । নানান পেপার ওয়ার্ক করতে সময় বয়ে যায় ।

তারপরে ওরা আবার ফিরতি পথের ট্রেন ধরে ।

এর ঠিক চারমাস পরে জয়শীল পাড়ি দেয় সুদূর বিদেশে । দেশের নাম মেরীউড ।

এই দেশ দক্ষিণ গোলার্ধে । বেশ বড় দেশ । সাহেব , মঙ্গোলিয়ান ও ইসলাম দেশের মানুষ থরে থরে আছেন , মিলেমিশে ।

এইদেশে এসেই ও প্রথমে পড়ার পাশে পাশে কাজে লেগে পড়ে । হোটেল , রেস্তোরাঁতে কাজ , গ্রসারি স্টোরে হিসেবের কাজ , লোকের বাড়ি ক্লিন করার কাজ ইত্যাদি । ছোট ছোট কাজ করে নিজের খরচ যোগাতো ।

কাকাবাবু ও কোকোমা এতদূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবার খরচ নিজেকেই যোগাড় করতে হবে তো !

এক সেমিস্টার পড়তো , পরের ছয়মাস কাজ করতো , আবার ছয়মাস পড়তো । এইভাবে ও একটি তিন বছরের কোর্স শেষ করে । সময় অনেক লাগলো ।

মাঝে একবার কি দুবার বাড়ি গিয়েছিলো । মা ভালই আছেন । কোকোমা একটু সুগারে কাহিল । কাকাবাবু ভালই আছেন ।

এইদেশে জয়শীলকে সবাই ডাকে জে বলে । জে এখানকার রীতিনীতেতে অভ্যস্থ হয়ে গেছে । ইতিমধ্যে একটি ইনকাম ট্যাক্স ফার্মে কাজ পেয়েছিলো । সেখানে দিবারাত্রি জেগে ও একটি চাঞ্চল্যকর সফটওয়্যার তৈরি করে । যাতে এইধরণের কাজে অনেক সুবিধে হয় ।

দিনে কাজ করতো , রাতে বেশি সময় থেকে ঐ সফটওয়্যার এর জন্যে প্রোগ্রামিং করতো । শেষকালে ফল মিললো । ওদের ফার্ম এটি কাজে লাগালো এবং পেটেন্ট করতে দিলো ।

জয়শীল ছোটবেলা থেকে ভাবতো যে এমন কিছু করবে যা সমাজের কাজে লাগবে । ও মানুষ হয়ে বাঁচতে চায় , শুধু একটি অস্তিত্ব হয়ে নয় । গড়পরতা অন্যান্য মানুষের মতন ।

এই স্বপও সফল হতনা , কাকাবাবু ও কোকোমা না থাকলে । নি:সন্তান এই দম্পতি নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন জয়শীলকে । ওদের ঋণ শোধ করা যাবে না এই জন্মে ।

সিগারেট খেতে খেতে ভাবছিলো জে । ওর প্রেমিকা পিপ্পা অর্থাৎ ফিলিপা খুব ভালো মেয়ে । ওর সাথেই কাজ করে । তবে জে হল সফটওয়্যারের আর ফিলিপা অ্যাকাউন্টেন্ট ।

ও পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট আমাদের দেশে যাদের বলে সি-এ । চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ।

পিপ্পার বাড়িতে ও গিয়েছে । এখন ওরা একসাথেই থাকে । মাঝে মাঝে পিপ্পার বাড়িতে যায় যা গ্রামে । ওর বাবা চাষী । অবস্থাপন্ন চাষী । ওদের ফার্মে ১০০০০ ভেড়া আছে ।

ওর মা ও বাবা দুজনে কঠোর পরিশ্রম করে এই ফার্মকে দাঁড় করিয়েছেন ।

ওদের আরো একটি সন্তান আছে । তার নাম ট্রেসি । এই ট্রেসি এক কঠিন নার্ভের অসুখে প্রায় বিকল । মস্তিস্ক চলে তবে আঁখিতে রং নেই । সবকিছু সাদাকালো দেখে আর সোজা কিছু দেখতে পায় না । সবাইকে ব্যাঁকা দেখে । উঁচু নিচু দেখে ।

এমনিতে মোটামুটি ভাবে মস্তিস্ক সজাগ আছে ।

বিশেষ কারো সাথে মেশে না নিজের বাবা মা বোন ব্যাতীত । কিন্তু জয়শীলকে খুব পছন্দ করে !

সবার মতন সে অবশ্যি জয়কে জে বলে ডাকেনা । ডাকে জিটা বলে । জিটা এলে ওর ভালোলাগে । তেরা ব্যাঁকা জয়শীল সহজেই এই সুন্দরী তরুণীর মন জয় করে ফেলেছে । ও তো

সবাইকেই ব্যাঁকা দেখে । আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট । তারই মাঝে জয়শীল এক আকাশ রং ---- ট্রেসি তুলি নিয়ে নানান চিত্র এঁকে চলে ।

আজব রোগ এটি । কোটিতে গুটির হয় । বিজ্ঞানীরা এখনও এর কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি । কার্য ও কারণ জানা নেই । শুধু একটি চেতনা আছে সামনে । সে কথা বলে অবশ্য : বলে --- সবার অতীত ও ফিউচার আছে । আমার আছে কেবল বর্তমান । আমি সময়ে বাঁধা পড়ে গেছি , জিটা বলতে পারো কেন কিছু কিছু মানুষের এমন হয় ?

আমি তো কোনোদিন কারো ক্ষতি করিনি মন্দও চাইনি , তাহলে ?

জয়শীল উত্তর দেয় না, কারণ উত্তর জানা নেই । শুধু বলে : আমি তো আছি , তোমার বড় বন্ধু !

পিপ্পার সাথে বিয়েটাও হয়ে গেলো । দেশ থেকে এসেছিলেন কাকাবাবু ও কোকোমা । মা আসেন নি কারণ মা প্লেনে চড়তে ভয় পান খুব ।

দূর থেকেই আশীর্বাদ করেছেন ওদের । পিপ্পা খুব ভালো মেয়ে । মাকে নিজে হাতে বুনে সোয়েটার ও মাফলার দিয়েছে ।

ওর মা রেণুকাকে , পিপ্পা ডাকে -মমি - বলে ।

--- মমির চিঠি এসেছে , মমি ফোনে তোমাকে ডাকছে , এগুলি পরিস্কার বাংলায় বলে পিপ্পা । যদিও সুরপাণি ও রেণুকা বাঙালী নন কাজেই ছেলেও অবাঙালী তবু পালিত স্যারের কাছে মানুষ বলে জয়শীল বাঙালীই হয়ে গেছে ।

পিপ্পা, মমির সাথে কথা বলার জন্যে বাংলা শিখেছে । রেণুকাও ভালই বাংলা পারেন । ওদের নিজেদের ভাষা কৈরিলি তত বলেন না আর । জয়শীলও বেসিক লেভেলে কৈরিলি পারে । কৈরিলি একটি হিন্দী ঘেঁষা মধুর ভাষা । ওর মাতাজী রেণুকা প্রফেসর পালিতের বাড়িতে থেকে অনেক ইংরেজি শব্দও আত্মস্থ করেছেন যা সময় অসময়ের ব্যবহার করেন । যেমন সব কথার পূর্বে : অ্যাকচুয়ালি শব্দটি বলা চাই-ই । এছাড়া , ক্যাচ করতে পারি কিন্তু পুট করতে পারিনা । অথবা ওয়েট লিফটার পতিদেব সম্পর্কে গল্প করতে গিয়ে বলেন : ওর তো বডিতে খুব মারসেল ছিলো (মাসেল , পেশী) । আর : আমার ছেলের ইন্টেলেজেন্সি ওর ড্যাডের কাছ থেকে টেক এওয়ে করেছে !

মা ও ছেলের মাঝে পিপ্পা কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি । কিন্তু এই পিপ্পার কারণেই মা ও ছেলের মাঝে একদিন নেমে এলো ধ্বস ! পাহাড়ি বিপুলাকৃতি ধ্বস ।

একদিন হঠাৎ সারপ্রাইজ পার্টি দিলো জয়শীল ও পিপ্পা । ঘর ভর্তি অ্যাকাউন্টেন্ট ও সফটওয়্যারের মানুষ । আই টি অ্যান্ড আই টি । ইনকাম ট্যাক্স ও ইনফর্মেশান টেকনোলজি ।

কী ব্যাপার ? সবার প্রশ্ন । উত্তর হল , আজ জয়শীলের বিয়ে ।

-বিয়ে ? ম্যান আর ইউ কিডিং ?

- নো স্যার ইট ইজ আ রিয়ল ওয়ান ।

রীতিমতন প্রিস্ট ডেকে বিয়ে । এক স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে ? তাও সুদূর পরবাসে ?

পশ্চিম দেশে ? এই বিয়ে বেআইনি।

নাহ্ একে আইন বহির্ভূত বলা যাবে না কোনমতেই কারণ জয় আইন ভাঙতে জানে না ।

ও সৎ । কাজেই পিপ্পার দিদি ট্রেসিকে বিবাহ করার জন্যে সে ধর্মান্তরিত হয়েছে । হয়েছে মুসলিম । নিজ ধর্ম ত্যাগ করা সহজ নয় । কিন্তু ওর বাবা মা ওকে শিখিয়েছেন যে জীবন ধারণ আগে ধর্ম পরে । ট্রেসি একমাত্র ওর সাথেই সাবলীল । ওর বাবা মা তো বলেন : আমরা যতদিন আছি ঠিক আছে , পরে মেয়েটির কী হবে ? কোথায় থাকবে ও ?

কোনো হোমে যদি নেয় সেখানে কি আর আমাদের মতন করে দেখবে ওকে ? আমরা ওর কাছের মানুষ কিন্তু অন্যদের কাছে

এরা একধরণের বোঝা । এদের মধ্যে অনেকেই কাজ করে কিন্তু ট্রেসি তো ঠিক মতন সবকিছু দেখতে অক্ষম । সাদাকালো দেখে আর তেরা ব্যাঁকা । তাই ও কোনো কাজ করতে পারেনা । তবে কথা স্পষ্ট বলে । চিন্তাশক্তিও মোটামুটি ভালই । শরীর অসাড় হলেও ।

অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত মেয়েটিকে জয়শীল ফেলতে পারবে না । ও যে জয়শীল , হারতে জানেনা !

ট্রেসির বাবা মাকে ও আশ্বাস দেয় : যত তাড়াতাড়ি আমরা বাস্তবকে মেনে নিতে পারবো তত ভালো থাকবো । আমাদের নিজেদের ত্রুটি , অসহায় অবস্থা ইত্যাদি থেকে না পালিয়ে সাহসে ভর করে এগুলির মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হবে । একমাত্র তাহলেই বাকি জীবনটা সুখের হবে । আমার একটি স্ত্রী স্বাবলম্বী অন্যজন ফুলের মতন , ভালনারেবেল । আমি এইভাবেই ভাবি । আর পিপ্পা তো আপত্তি করেনি কোনো !

এই রুগীদের সাথে বিবাহিত জীবন যাপন করা যায়না কিন্তু মানসিক আশ্রয় দেওয়া চলে । সেটাই আমি দিতে চাই ।আমি পরজন্মে বিশ্বাসী । অনেক জন্ম তো অনেক আনন্দ ফূর্তি করে কাটালাম , এই জন্মটা আমি একটু সেবার দিকে মন দিই-আর ট্রেসির সাথে কথা বলতে আমার ভালই লাগে বিশেষ করে ঐ একমাত্র আমার হেড়ে গলার গান শুনে ক্ল্যাপ দেয় , এটা কি আমার মতন সঙ্গীত প্রেমীর কাছে কম পাওয়া ?

সুদূরঃ দেশ ভারতে ভেঙে যায় একটি মন । সুরপানি জায়া রেণুকার মন ।

প্রফেসর পালিত বলেন : বহিনজী , আপনার সন্তান একটি মহান কাজ করেছে , ওকে আশীর্বাদ করুন ।

মুক্তমনা , শুদ্ধ চেতনার অধিকারী রেণুকা , যিনি সন্তানকে শিখিয়েছিলেন : মানুষের কল্যাণে কাজ করবে । মানুষ বড় আর কিছু নয় তিনি আজ কিছু বলেন না । জয় এর কোকোমার কাঁধে মাথা রেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন -- আমার ছেলে ইন্‌সেন ! ইনসেন্‌ !

বিড়াল

এই গল্পটি শুনি এক মেয়ের কাছে , সুইজারল্যান্ড বেড়াতে গিয়ে ।

জুরিখ থেকে ইন্টারলাকেন যাবার পথে এই মেয়ের সাথে আমার আলাপ । মেয়েটি বাঙালী ।

নাম হল সোহিনী লক্ষ্মীনারায়ণ । বঙ্গতনয়া হলেও বিয়ে করেছিলো এক দক্ষিণী যুবককে ।

তাই পদবী লক্ষ্মী নারায়ণ । মেয়েটি আমার সহযাত্রী । ট্রেনে আমরা চিকেন কারি ও রাইস খেতে খেতে বাইরের অপরূপ দৃশ্য দেখছিলাম । উল্টোদিকে বসেছিলেন এক বয়স্ক মানুষ । মানুষ বলছি কারণ উনি নারী না পুরুষ বোঝার উপায় নেই । পোশাক আশাক কিংবা মুখের বলিরেখা কিছুই হদিস দেয়না উনি নারী না পুরুষ । জানার উপায় নেই । যাইহোক , মানুষ তো বটেই !

ওকে জিজ্ঞেস করলাম , এত সুন্দর দেশ সুইজারল্যান্ড , তোমাদের কি মজা , সব সময় এখানে থাকো , উপভোগ করতে পারো , আমরা কতনা দূর দেশ থেকে এসেছি !

আমি আসলে বেড়াতে গিয়েছিলাম কিন্তু সোহিনী ওখানকার বাসিন্দা।

ও ইউরোপেই পড়াশোনা করেছিলো। হায়ার স্টাডিজ। বায়ো টেকনোলজি।

বিদেশি/নী আমাকে বললেন : আমরা এখানে জন্ম থেকে কাজেই আমাদের দেশ এত্তো সুন্দর সবাই বলেন কিন্তু আমরা সেটা অত বুঝতে পারিনা, সবসময় তো এগুলো দেখেই বাঁচছি।

আমরা হাসলাম। সত্যি চোখে সয়ে গেছে ওদের।

অপূর্ব দেশ এই সুইজারল্যান্ড। ফুলে ফুলে ছাওয়া। বরফের মাঝেও যেন কেউ অপরূপ ফুল ফুটিয়েছেন। রাস্তাঘাট, বিল্ডিং একদম ঝকঝকে। সেরকম পাল্লা দিয়ে প্রাকৃতিক শোভা। বিধাতা এখানে রূপ আঁকতে একটুও কার্পণ্য করেন নি। তুলিরেখায় রং এর জলজ সাবলীলতা। ফুটে উঠেছে অবর্ণনীয় সব চিত্র। ভাষায় প্রকাশ করা যায়না, অনুভব করতে হয়, দেখতে হয়। নিজ চক্ষে। কারণ বর্ণনা যেই করুক তার মধ্যে সেই ব্যাক্তির নিজস্ব কল্পনা ও মত লেপটে থাকবেই এক বিন্দু হলেও।

সোহিনী খুব মিশুকে। ওর স্বামী আর ও এখানে কাজ করে। একটি মেয়ে, নাম আদিরা শর্টে লোকে ডাকে, অ্যাডি।

ওর স্বামী এখন এখানে ভারতীয় কোনো সংস্থায় কাজ করেন । ভদ্রলোক আগে ডিপ্লোম্যাট ছিলেন । খুব ধুরন্ধর মানুষ । পেছনে নাকি তার আরো দুটো চোখ থাকে সব সময় ।

সোহিনী যেই গল্পটি শোনালো তা খুব আকর্ষক ।

অনেক বছর পূর্বে ও একজন বিজ্ঞানী হিসেবে মধ্যভারতের এক গভীর অরণ্যে কাজে গিয়েছিলো । যদি ধরা হয় সেই অরণ্যের নাম : ভিন্দপুরা তাহলে সেটি হল ভারতের গভীরতম অরণ্যের মধ্যে একটি । সবুজ ঘন বন , পথ সবসময় গাঢ় আঁধারে ঢাকা আর অসংখ্য আজব জন্তু সেই বনে । যেমন একটির নাম হুতো বিল্লী ।

এই হুতোবিল্লী বেশ বড় সড় সাইজের এক বিড়াল । অনেকটা বাঘের মতন । হিংস্রও বটে । এর উপদ্রবে জঙ্গলের অন্য জানোয়ারেরা মাঝে মাঝে খুবই বিপদে পড়ে । তবে এই জন্তুটি নাকি দিনে ২০ ঘন্টা ঘুমায় । যেই ৪ ঘন্টা জেগে থাকে সেই সময়টুকু নিংড়ে দেয় খাদ্যের সন্ধানে । বাকি সময়, যদি অবসর মেলে তখন অন্য জানোয়ারদের আক্রমণ করে ।

এর জ্বালায় বনে অন্য প্রাণী প্রায় নেই । ছোট খাটো প্রাণীরা নিঃশেষ ।

বনবিভাগ বহুবার চেষ্টা করেছে যাতে একে মেরে ধরে বাগে আনা যায় অথবা একেবারে লোপাট করে দেওয়া যায় কিন্তু স্থানীয় বনচরেরা এর বিরুদ্ধে । কারণ এই আজব প্রাণী ওদের

গর্ব , ওরা নিজেদের ছেলেপুলেদের এগুলি দেখাতে চায় । ওদের এক ধরণের হেরিটেজ বলা চলে । এই নিয়ে সরকার পক্ষের লোক ও বনচরদের মধ্যে ভালই মনোমালিন্য হয় ।

এই জায়গার আরেকটি বিশেষত্ব আছে । তাহল এখানকার বনচর সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ।

এখানে মেয়েরা সব । ওরাই সমাজের শিখরে , সংসারের কর্ত্রী । পুরুষেরা কিছুটা হীনমন্যতায় ভোগে । ওদের সহজাত দাপট ও পৌরুষ যেন এক ঝটকায় নিভে যায় এই এলাকায় প্রবেশ করলে । এখানে পুরুষেরা মেয়েদের দ্বারা চালিত ।

মেয়েরা নিজের ইচ্ছে-ই সম্বন্ধ স্থির করে । কতকটা আমাদের পুরাতন যুগের স্বয়ংম্বরের মতন । বিয়ের পরে ছেলেরা শ্বশুর গৃহে পদার্পণ করে ।

যৌতুক নিয়ে যেতে হয় । মেয়ের জন্যে দামী গহনা ও বহুমুল্য পোশাক সামগ্রী । নচেৎ যথেষ্ট যাতনা সইতে হয় ওদের, মেয়েদের হস্তে । এখানে সমাজ নারীশাসিত কিন্তু আমাদের মূল সমাজের মতনই সমস্ত সমস্যায় জর্জরিত । আসলে মানুষ যেখানেই থাকনা কেন তাদের ইগো তো সঙ্গেই থাকে কাজেই একেবারে একশো শতাংশ পার্ফেক্ট সমাজ কী আর হয় ?

মায়েরা একটা সময় বিড়াল রক্ষায় লড়াইতে নামে ।

ঘাগরা পরা , মাথায় ওড়না , বড় ব্লাউজ । হাতে অজস্র পেতল কিংবা অ্যালমুনিয়ামের চুড়ি ।

এরাই এখানকার পুলিশ স্টেশান , চৌকি , দোকান সবকিছুর মাথায় । এখানে মেয়ে দারোগা ব্যাতীত অন্য কিছু দেখা যায়না ।

সোহিনী মজা পেলো । খোদ কলকাতায় একটি কোম্পানি আছে যেখানে কেবল মহিলা কর্মী । কোম্পানীটি পরিচালনা করেন দুই চৈনিক মহিলা । সমস্ত কর্মী মায় দ্বরোয়ান , সিকিউরিটি গার্ডও মহিলা । কিন্তু এতদূরে একটি বনজ ভূমে এত মহিলা মিলে পুরো একটি সমাজ পরিচালনা করেন যুগ যুগ ধরে তা দেখবার কৌতুহল হওয়াই স্বাভাবিক । উপরন্তু ওকে সরকার থেকে একটি গুরুত্বপুর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছে । কাজেই ও একদিন এই এলাকায় হানা দেয় ।

জিপ থেকে নামে বনবাংলোর সামনে । ২০ কিলোমিটার দূরে ওর ল্যাব । এই জিপ এসেই রোজ নিয়ে যাবে । বিকেলে বাড়ি ফিরে বনচরদের সাথে মিতালি করে ।

মেয়েরা ও বৌয়েরা খুব দাপটের সাথে আছেন । পুরুষেরা নেতিয়ে ।

ও জানতে পারলো যে ইদানিং এখানে এক বড় সড় বন বিড়ালকে নিয়ে খুব হল্লা হচ্ছে । বনবিভাগেরা কর্মীগণ ওদের প্রজাতিকে নির্মূল করতে চান । আর মানুষ চান ওদের ধরে রাখতে । নিজেদের সন্তান সন্ততিদের দেখাতে চান এই অদ্ভুত

বিড়াল । যা সাধারণ মার্জারের চাইতে অনেক বড় আবার বাঘের থেকে ছোট ।

হিংস্রতায় বাঘের কাছে আর অহিংসায় বিড়ালের থেকে অনেক দূরে ।

এই নিয়েই গোলমাল বাধে । স্থানীয় নারীরা সরকারকে বিনীত অনুরোধ জানিয়েও কিছু করতে পারে না । সরকার নির্দেশ দেন বিড়াল মারতে ।

এবং নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় ।

আধুনিক অস্ত্র ব্যবসায়ী, রণসজ্জায় সজ্জিত মানুষ এক আজব প্রজাতির বিড়ালের হিংস্রতাকে বাগে আনতে কতক্ষণ সময় নেবে ? কাজেই শেষ হয়ে গেলো বিড়াল ।

বনজ বিড়াল । লুপ্তপ্রায় প্রাণী ছিলো যা ।

অতিরিক্ত সমস্যা সৃষ্টি করলে তো তাকে লুপ্ত হতেই হবে গুপ্ত ঘাতকের হাতে । এই তো জগতের নিয়ম ।

বনজ মানুষের হৃদয় ক্ষত , রক্ত ওদের দেহের প্রতিটি আবরণে । ওরা ক্ষয়াটে , ভঙ্গুর । ব্যাথায় , বেদনায় । ওরা পরাজিত ।

এর ঘটনার দিন দশেক পরে একজন বনজ কিশোর নাচত নাচতে এগিয়ে আসে নিজের কুটিরের দিকে ।

আরো দুটি এরকম বন বিড়ালকে নাকি দেখা গেছে বনে । তারা ওরকমই দেখতে কিন্তু কেমন যেন হাসছে । ওদের মধ্যে তেমন হিংস্রতা নেই ওদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে । আর ওরা অত ঘুমায় না মনে হয় কারণ ছেলেটি বনে কাঠ সংগ্রহে গিয়েছিলো , সারাদিনই প্রায় ঐ দুই মার্জারকে চাক্ষুষ করেছে । ঐ বিড়ালেরা শান্ত । চোখের জ্যোতি স্নিগ্ধ- নীল আলো ।

ল্যাবের দরজা খুলে ঢুকলেন বড়সাহেব মিস্টার মিশ্র । প্রফেসর নীরজ মিশ্র । লোকে বলে মিশ্‌রা । পিঠ চাপড়ে দিলেন গবেষিকা সোহিনীর । বললেন : তোমার প্রজ্ঞাই আমাদের এই সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করলো । কিপ ইট আপ ।

সেদিন সন্ধ্যায় একটি ডিনারের আয়োজন করেছিলো ল্যাবের বিজ্ঞানী ও ছাত্রেরা । সংবর্ধনা দেওয়া হল সোহিনীকে । কারণ মূল ভাবনাটি ওর মস্তিস্ক প্রসূত ।

বায়োটেকনোলজির নবতম অবদান এই রহস্যময় মার্জার ।

বিজ্ঞানীরা ল্যাবে সৃষ্টি করেছেন এই বিড়াল যার সবকিছুই ঐ হিংস্র বিড়ালের মতন শুধু নখদন্ত নেই , আক্ষরিক অর্থে নয়, অবচেতনে ।

দূরের নীলাভ আকাশ মায়াবী , ট্রেনের গতি কমে আসছে কারণ আমরা পৌঁছে গেছি মোহময় ইন্টারলাকেনে , প্রায় ।

সুইস মানুষটি বললেন ,দেখো দেখো , ঐ গাছটায় কেমন বিন্দু বিন্দু বরফ ঝুলে আছে !

সোহিনী দেখলো মানুষটি আস্তে আস্তে বিড়াল হয়ে যাচ্ছে ।

পুরো দেহটি মার্জারের আকার নিলো । তারপর রেলগাড়ির কাচের জানালা ভেদ করে নেমে গেলো মহাশুন্যে ।

গাছের বরফ বিন্দু খুবলে খাচ্ছে অপরূপ দেশ সুইইজারল্যান্ডের এই অদ্ভুত মানুষ । যিনি নারী না পুরুষ ওরা জানতে পারেনি ।

এখন ওরা নিশ্চিত যে উনি একটি মার্জার । নিরেট বিড়াল ।

গাছের গায়ে শিশির , তাতে বরফ বিন্দু আর ঐ মার্জার !

কেমন তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে গাছের মগডালের দিকে !

ওরা দুজনে দেখছে , অবাক নেত্রে ! আর বিদুষী , যশস্বিনী সোহিনী ওর জ্ঞান শানাচ্ছে ।।

মানুষটি বলে গেলো যাবার সময় ---আমি কিন্তু বিজ্ঞানের চমৎকার নই ---আমি চিন্তাকে রূপ দিতে পারি ----তোমরা যাকে বলো থট প্রজেকশান -- ভাবলাম মার্জার হবো ---------আর তখনই !!

ময়নাবাড়ি

বাংলার এক চা বাগান এলাকা । হাঁটু সমান চা গাছ আর মাঝে মাঝে বড় বড় আকাশ ছোঁয়া বৃক্ষ । এখানে বেশ কয়েকটি চা বাগান আছে । স্থানীয় মানুষের কাছে যা পরিচিত বাগান বলে ।

ওরা বাগানে কাজ করে । দল বেঁধে আসে, যায় , আসে যায় । কচি কাঁচা কোচড়ে । মাথায় রঙীন কাপড় বাঁধা । বাগানের ম্যানেজার , চিকিৎসক , কম্পাউন্ডার ইত্যাদি ব্যাতীত সবাই মালিক পক্ষের লোক ।

বাকিরা শ্রমিক ।

এখানে খুব উচ্চমানের চা জন্মায় । টি টেস্টারগণ সেই চায়ের স্বাদ গ্রহন করার জন্যে উন্মুখ । শ্রমিকরা প্রচুর পরিশম করে কিন্তু সেই অনুপাতে অর্থ রোজগারে অক্ষম । উপরন্তু মালিকেরা ওদের বেত্রাঘাত করে ও প্রয়োজনে টিপ সই আদায় করে নানান

বেআইনি কাজে ভিড়িয়ে দেয় । এই ধরণের কার্যকলাপ আজ বহু যুগ ধরে চলেছে । ব্রিটিশ সরকার চলে যাবার পরে বেড়েছে অত্যাচার ।

আমাদের গল্পের পটভূমি একটি সবুজ চা বাগান নামটি যার - ময়নাবাড়ি । এরকম নামের একটি ইতিহাস আছে । একবার এই অঞ্চলের প্রথম চা বাগানের মালিক এক গোরা সাহেব এখানে উড়ে আসা ময়না পাখিকে তীর বিদ্ধ করে । সেই সময় স্থানীয় আদিবাসী দুই যুবক সেই মালিককে কচুকাটা করে ।

--একটি নিরীহ পাখিকে মারলে সাহেব ? তুমি তবে মর । বলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে ওকে সেই যুবকের মধ্যে একজন , হিমল নাম তার । সাহেব মারা যেতে এই এলাকা বিখ্যাত হয়ে ওঠে রাতারাতি । তারপরে আরো চা বাগান গজায় । নামও হয়ে যায় ময়নাবাড়ি ।

--ঐ হোথায় ঐ ময়নাবাড়ি গো যেথা হিমল মারে গোরা রাক্ষসেরে ।

ময়নাবাড়ির সাথে সাথে যেন জড়িয়ে আছে একটু হিংস্রতার গন্ধ । এখানে বর্তমান কালের চা বাগানের মালিকেরাও বেশ কৃপণ

ও শ্রমিকের অপছন্দের মানুষ । মাইনে পত্তর নিয়ে প্রায়শই গোলমাল লাগে । বেশি খাটায় , টাকা দেয়না সময় মতন । গরীব মানুষ সব । এদের কাছে এক একটি মোহরের দাম অনেক । অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসা হয়না ।

একজন ডাক্তার আছে , সুদীপ সেন । কলকাতা থেকে পড়ে এসেছেন । বাবা সাচ্চা কমিউনিস্ট ছিলেন । এখন মৃত । কাজেই সুদীপ ডাক্তার ওদের কাছের মানুষ । মন খুলে সব বলে ওকে । আর ওর স্ত্রী মহুয়াকে ।

ওরা দুজনে খুব সুখী । অবসরে হিমালয়ে চলে যায় । পাহাড়ি ঝর্ণায় অবগাহন করে ফিরে আসে ময়নাবাড়ি ।

মাঝে মাঝে অবশ্য মহুয়া একটু রেগে যায় । তখন ওর বর সুদীপ ওকে কোলে নিয়ে উঠোনে চন্দন গাছটার নিচে চলে যায় । বলে : এবার আমি মহুয়া ধিতাং নাচবো ।

মহুয়া লাফ দিয়ে নেমে পড়ে : কি হচ্ছে ছিঃ ছিঃ- ছাড়ো , লোকে কী ভাববে ?

দূরে দাঁড়িয়ে ক্ষয়াটে বালু । বাগানের শ্রমিক । কম বয়সী ।

হ্যা হ্যা করে হাসছে । সুদীপ ওকে তাড়া করে , ও পালিয়ে যায় , আকাশের সীমা ছাড়িয়ে । মিলিয়ে যায় দিগন্তে ।

এইভাবেই কাটে ওদের জীবন ।

বাজারে বড় পোনা রুই এলে কেউ কেনার সাহস পায়না । কারণ মাছ যাবে বড়লোকের বাড়ি । গরীব গুর্বো এইসব দামী মাছ দিয়ে করবেটা কি ?

কিন্তু সুদীপ ডাক্তারকে লোকে এতই সমীহ করে যে ও বড় মাছ নিয়ে গেলে কেউ ব্যাগড়া দেয় না । ওকে দরিদ্ররা খুব মানে ।

মহুয়াকে বলে বৌমণি । মহুয়ার ভালোলাগে । আগে ছিলো কলকাতায় । বাবা মেডিক্যাল অফিসার । সুদীপের সাথে ১২ ক্লাস পাশ করেছে । তারপরে কমিউনিস্ট পরিবারে বিয়ে দেবেন না বলে বাবা বেঁকে বসেন । কিন্তু পরে মত বদল করে রাজি হন । মহুয়া সাহা হয় মহুয়া সেন । এম এস। ওর বর বলে : তুমি এম এস । বিয়ের আগেও, পরেও ।

মহুয়া ভ্রূ পল্লবে ডাক দিয়ে যায় ---হ্যাঁ এম এস । এস এম এস নই !

মোবাইলে আবার কোনো সুন্দরীকে উল্টোপাল্টা এস এম এস করো না তো ? লুকিয়ে লুকিয়ে ?

সুদীপ হাসে , হেসে ওর কোমড় জড়িয়ে ধরে বলে : হ্যাঁ করি , এম এস কেই একমাত্র !

এখানে সুদীপের এক বন্ধু আছে । সে তৃতীয় লিঙ্গের ধারক ও বাহক । অর্থাৎ নপুংসক ।

বহুদিন সে নিজ পরিবারের সাথেই পুরুষ রূপে ছিলো । নাম ছিলো দুলারিকুমার ।

ওকে সবাই দুলারি বলে । লোকটি খুবই মেধাবী । স্থানীয় মানুষ । পাহাড়ি আর বাঙালির মিশ্রণ ।

সে পেশায় ছিলো সি এ -অর্থাৎ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ । একবারে পাশ করেছে । আসছে বছর আবার হবে -করে নয় ।

তার আগে ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি বা ইগনু থেকে এম বি এ করেছে । মার্কেটিং-এ । বেশ তুখোড় । কাজ করতো ভালো কোম্পানিতে, শহরে । ময়নাবাড়ির মানুষ ।

একা মানুষ । এখানে প্রায়ই আসতো । লোকের দূর্দশা দেখে দেখে মন গলে । চাকরি ছেড়ে একটি সংস্থা গড়ে - দুটি পাতা ।

সেই সংস্থা স্থানীয় গরীব মানুষের নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে ।

অর্থের প্রয়োজনে ওরা স্বল্প ধার দেয় । সুদ বিহীন ধার করা টাকা । গরীবের সোনা ।

মানুষের সুখ দু:খের কথা মনযোগ সহকার শোনে ।

সুদীপ দেখেছে যে শেষ কপর্দক বিক্রী করে লোকে চিকিৎসা করাতে আসে । এদেরকেও সাহায্য করে দুলারিকুমার , সুদীপদের দুলু আর মহুয়ার দুল ।

মহুয়া বলে : তোমার নামটি বাপু মেয়েদের মতন , দুলারি , তাই আমি শর্টে ডাকবো দুল ।

দুলারি কাষ্ঠ হাসি হেসে বলে : বৌমণি আমি তো কোনোটাই নই তাই যে যা ইচ্ছে ডাকতে পারে । বুলাতে পারে ।

দুলারি আবার মাঝে মাঝে হিন্দি বলে ।

সুদীপ বলে : ও রেগে গেলে কিংবা দু:খ পেলে হিন্দি বলে ।

যেমন একবার ও , ওখানে বাক্স আছে , তাতে চাবি আছে সেটা দু:খ পেয়ে অশুদ্ধ হিন্দিতে বলে ওঠে : হুয়া পড় এক বাক্সা হ্যায় অউড় বাক্সা মে এক হি চোয়াবি হ্যায় !

অথবা রেগে গিয়ে একদিন বলে ওঠে : যাও সুদীপ যাও , যা কে আভি ইসি ওয়াক্ত অউর হরবকত এক গ্লেস পানি লাও ।

ওর কথার মর্ম বুঝে নেয় সুদীপ ও মহুয়া । কারণ হিন্দি দূর্বোধ্য । ভাগ্যিস মুন্সি প্রেমচাঁদ জীবিত নেই । হিন্দির এত বড় অপমান !

সুদীপ তো কলে যায়না । একবার এই এলাকার কিছু লোক এক ডাক্তারকে কলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে । ওর প্রতিপক্ষের কারসাজি এটি ।

তাই মহুয়া আজকাল সুদীপকে কলে যেতে দেয়না -- রুগীরা বাড়িতেই আসে ।

দুলারি কুমার অবশ্যি বলে : এ অন্যায় সুদীপ । কতগুলো অ্যান্টি সোসালের ভয়ে তুমি বাড়ি বসে থাকবে ? রুগীরা তোমার মতন ভালো ও সহৃদয় ডাক্তারের চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবে ?

সুদীপ মুখটা গোমড়া করে বলে : দুলু , আমার জন্যে ভাবিনা রে , তোর বৌমণি আর ছেলেটার মুখ মনে পড়ে যায় !

ওদের একটি মাত্র সন্তান । নাম আভরণ সেন । ডাক নাম টোটা বা টোট ।

আসলে ও জন্মেছিলো কালীপুজোর সময় । তাই নামে বারুদ গন্ধ ।

সম্প্রতি এই এলাকায় বহু খুন খারাপি হয়েছে । বাগানের শ্রমিকেরা মালিকদের মারধোর দিয়েছে ও দু তিনজনের নৃশংস হত্যাও হয়েছে ।

যারা করেছে তারা ধরাও পড়েছে । হতদরিদ্র শ্রমিকেরা আজ কারাগারে । দুবেলা পেট পুরে খেতে পেতোনা । এখন বৌ বাচ্চারা অনাথ । যাদের বৌয়েরা কাজ করতো বাগানে তাদের ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে , ক্রিমিন্যালের আত্মীয় বলে ।

আগুন লেগেছে , বাগানে , এক প্রকার ।

কিছু মালিক বাগান বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাবার কথা ভাবছেন ।

নিজেদের বাড়িতে গৃহকর্ম করানো , ফাই ফরমাইশ খাটানো , বাগানের কাজের বাইরে এসব করানো যা বেআইনি এবং তার জন্যে কোনো মজুরি না দেওয়া , প্রয়োজনে মারধোর দেওয়া , চূড়ান্ত অপমান ও নারীদের নানানভাবে অবমাননা করা । কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মেয়েদের অসম্মান করা এইসব নিয়ে জনরোষ বহুদিন দানা বাঁধছিলো । পরে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । শ্রমিকেরা ধর্মঘটে নামে । সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন ।

এখানে যেই চা বাগিচা সবচেয়ে বড় সেইখানে লেগেছে দাবানলের আঁচ , সেই বাগানের মালিকের হত্যার পরে ওরা সবাই দুটি পাতা সংস্থার মানুষ দুলারিকুমারকে ঐ বাগানের রক্ষক হিসেবে দেখতে চায় । সবুজ গালিচা মোড়া বাগানে আসুন দুলারি বাবু -----

ওরা বলে : দুলারি বাবু এলে আমরা সবাই আবার কাজে আসবো । সব অপমান ভুলে যাবো । দুলারি বাবু আমাদের অনেক ভালো করেছেন আরো করবেন এবার ।

আর উনি তো একা মানুষ ,সংসার নেই , টাকার লোভ নেই , সমাজ সেবা আগে থেকেই করতে অভ্যস্থ । কাজেই একমাত্র উনিই পারবেন আমাদের রক্ষা করতে ।

দুলারির মনের ভাবে বোঝা যায়না তবে ও লোকের জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ।

এরকম সেলফ্ লেস মানুষ আজকালকার বাজারে বড় একটা চোখে পড়ে না ।

সুদীপ ওদের বাড়িতে একদিন ওকে ডাকে , খেতে ।

ও কচি পাঁঠার মাংস খুব ভালোবাসে । মহুয়া নিজে হাতে রান্না করে ।

এখানে এখন বনের পাশ দিয়ে মানুষ গাড়ি চালিয়ে যেতে ভয় পায় । রাতবিরেতে লোকে আক্রান্ত হয়েছে উন্মত্ত শ্রমিকের হাতে ।

তাই মহুয়ার বান্ধবী রেশমা বাড়ি যাবার সময় বলে : আমাদের যদি পুলিশ এসকর্ট থাকতো তাহলে সুবিধে হত ।

দুলারি কুমার বলে ওঠে : আমি আপনাদের পৌঁছে দিতে পারি । তবে আমার জিপে যেতে হবে , আমার কার নেই , জিপে কিন্তু বসতে অসুবিধে হতে পারে ।

রেশমা বলে : আমাদের কোনো অসুবিধে নেই তাতে ।

ওর দুই সন্তান ও স্বামী এবং এক দেওর , সবাই মিলে জিপে চড়ে রওনা দিলো ।

দুলারি যাবার সময় হাত নেড়ে বলে গেলো , ফিরে এসে আমি আরেকটু ভাত খাবো । বৌমণি মাংস রেখো আমার জন্যে ।

সুদীপ অপেক্ষা করে রইলো ।

যাবার সময় গাড়িতে বড় করে সাদা বোর্ডে লাল কালিতে লিখে নেওয়া হল : এটা দুলারি কুমারের গাড়ি , সওয়ারিরা ওর বন্ধু হন ।

বেশ অনেক রাতে দুলারি ফিরলো । সুদীপ ওর সাথে বসলো ।

মহুয়া আরো মাংস ও ভাত দিলো ওর থালায় ।

সুদীপ আগেই খেয়েছিলো । মহুয়াকে দেখতে একেবারে পুণম ধীলনের মতন । তাই দুলারি ওকে মাঝে মাঝে পুণম বৌদিও বলে ।

ঠাট্টার ছলে । ভালো মুডে থাকলে ।

সেদিন রাতে উঠেছে গোল রূপার চাকতির মতন চাঁদ , সেইদিকে চেয়ে দুলারি গেয়ে ওঠে :

------মন খুশি উর্বশী এই রাতে ----

দুলারির এক এক্স কলিগের স্ত্রী বাড়িতে লিপস্টিক পরে থাকতেন - নাম তার উর্বশী । তাই না শুনে মহুয়া অবাক হয় , বলে- আফটার অল তো নিজের বাড়ি !

সুদীপ বলে , আরে অবাক হবার কী আছে , সৌরভের বৌ ওদের বাড়ির রিসেপশানে বসে ! সে ওদের বাড়ির রিসেপশনিস্ট ।

সবাই হেসে ওঠে ।

কথায় কথায় সুদীপ জানতে চায়- দুলারি এই কর্মকান্ডের ভার নেবে কিনা ,ময়নাবাড়ি চা বাগিচার ভার যা শ্রমিকেরা ওকে দিতে চাইছে ! আর ম্যানেজমেন্ট তো ওর পড়াই আছে ।

কাজেই শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা থাকায় কাজটিও ভালো পারবে ।

দুলারি হাসে , মৃদু মুখ নাড়িয়ে । তারপরে পাল্টা প্রশ্ন করে --- আমি কি নেবো ? তোর মত কি ?

সুদীপ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে : আমার তো মনে হয় তোর এই চ্যালেঞ্জটা নেওয়া উচিৎ ও দেখিয়ে দেওয়া উচিৎ যে আজকাল সৎ মানুষেরা কোনো ক্রিমিন্যাল নয় । সাধারণ মানুষ পরিবর্তন

চায় এবং তা সৎ পথেই । তোর কেউ নেই , তুই তো একা , নির্লোভ ও সৎ ।

তোর মতন মানুষের আমাদের সমাজে আরো প্রয়োজন । আজ কোর্ট তোদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে , তুই-ও প্রমাণ করে দে যে কোনো মহৎ কাজে তোদের কমিউনিটি পিছিয়ে নেই রামা শ্যামাদের চেয়ে । মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বে , লিঙ্গে নয় ---

তারপরে একটু মজা করে চোখ মটকে বলে :নট ইন হোয়াট ইজ দেয়ার বিটউইন দা লেগস্ !

দুই বন্ধু এবার নানান রসিকতায় মেতে ওঠে ।

দিনটা এইভাবেই শেষ হয় ।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে দুলারিকুমার দুটি পাতার ভার অন্য এক সহকর্মীকে দিয়ে নিজে টি গার্ডেনের ম্যানেজার নিযুক্ত হয় । শ্রমিকেরা স্বভাবত:ই খুবই খুশি হয় ।

কিন্তু কোম্পানির একদল মানুষ এর বিরুদ্ধাচরণ করে । ওদের মতে ওরা দুরাআ ম্যানেজারের অধীনে কাজ করবে কিন্তু এই বিকৃত গোত্রের একজন মানুষ যার কমিউনিটির লোক জোর করে মানুষের থেকে টাকা আদায় করে ও না দিলে শাপ দেয় , অপমান করে , কুৎসিত যৌন ইঙ্গিত করে তাকে এতবড় আসনে ওরা দেখতে চায়না । যতই ভালো কাজ হোকনা কেন

ওরা এর কথা শুনবে না । ওদের বিবেক ও সামাজিক সম্মানে বাধছে । ওদের পুত্র কন্যাদের শেষে বিয়ে শাদি হবেনা । একজন নপুংসক ওদের বস, ম্যানেজার এরকম জানলে ময়নাবাড়ির ছেলেমেয়েরা অবিবাহিত থেকে যাবে ।

কাজেই এটা পরিবর্তন নয় এটা হল পদস্খলন । ওরা নীতিগত ভাবে এর বিরুদ্ধে । কাজেই দুলারি কুমার যে নারীও না পুরুষও নয় সে পিছু হটো । অন্য মানুষ-ম্যানেজার আনা হোক । এরকম অর্ধ মানুষকে কেউ মানবে না ।

শ্রমিক কূলের সমস্যা নয় এটি । এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে অন্যান্য কর্মীরা । যেমন অফিস ক্লার্ক , হিসাবের কর্মীরা ।

কোম্পানীর পুরাতন মালিক মৃত । ওর পরিবারের কেউ আর নেই কাজেই তারা এই ঝামেলায় নেই ।

যারা আছে তাদের সবাই শনাক্ত করতে সক্ষম । কেউ গা ঢাকা দিয়ে নেই ।

সবাই সামনে দাঁড়িয়ে , সবাই স্বচ্ছ শুধু তাদের আবদারের বা হুমকির কারণটা মানবিকতার দিক থেকে বিচার করলে খুব অস্বচ্ছ ।

সুদীপের সাথে কথা বলে দুলারী ওর ত্যাগপত্র দিয়ে দেয় ।

তারপর মহুয়াকে বলে : বৌমণি তুমি বলছিলে এ আমাদের পরাজয় , না গো পরাজয় নয় এ-হল তাদের পরাজয় যাদের জগৎ-টা সংকীর্ণ । একমুখী । ওয়ান ডায়মেনশান ।

ইউনিভার্স মাল্টি ডায়মেনশান , আর নেচার সিঙ্গুলারিটি তে চলে না । কাজেই আবার কোথাও কোনো দুলারি একদিন জন্মাবে যার হাতে আমার থেকে অনেক বেশি শক্তি ও শত্রু দমনের মুদ্রা থাকবে । সেই আবার আনবে বিপ্লব । আমার কৃতিত্ব এতেই যে আমি একজন এই কমিউনিটির মানুষ হয়েও লেখাপড়া শিখে মূল সমাজে সম্মান পেয়েছি ।

বাকিটা করবে অন্য মানুষ , অন্য কোথাও , অন্য কোনো সময় ------- আমাদের ঠাকুর বহুচর মাতার কাছে এই ব্যাপারে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি ।

মহুয়া বলে : তোমাদের কমিউনিটির ঠাকুর বহুচর মাতার গল্প আমি পড়েছি । খুব টাচি ।

তোমাদের মধ্যে তো বিবাহপ্রথা আছে । তুমি এবার একটা বিয়ে করে ফেলো ।

কথাগুলো মনে হয় দুলারি কুমারের কানে যায় নি । কারণ সে ততক্ষণে নক্ষত্রের দিকে হাঁটছে । লম্বা লম্বা পা ফেলে ।

মহামানবেরা তো তারায় তারায়-ই বাস করেন ! এই ক্ষুদ্র জমিতে কি তাঁদের বাঁধা যায় ?

সুগন্ধার প্রেম

বাংলার এক ছোট গ্রাম করালী । নামটি একটু ভয়ানক হলেও মানুষগুলি ওখানে খুবই সাদাসিধে ।চাষী মেয়ে , বৃদ্ধ স্কুল মাস্টার , পিওন আর বেশ কিছু মুসলিম মানুষ নিয়ে এই গ্রাম । হিন্দু অনেক কম । তবুও দুই পক্ষে কোনো ঝামেলা নেই ।

মিলেমিশে থাকে ।এক হিন্দু বয়স্ক টিচার আছেন -নাম সুগন্ধা গুপ্ত ।

একাই থাকেন । কিছু দূরে ওর তিন ভাইয়ের বাড়ি । তারা নিজেদের সন্তান নিয়ে সুখী গৃহকোণে । মাঝে মাঝে যান , ওরাও আসে ।

এই দিদিমণি স্কুলে খুব জনপ্রিয় । সব ছাত্রই প্রায় মুসলিম । কিছু বৌদ্ধ্যও আছে ।

ভদ্রমহিলা ইতিহাসে এম এ ও পরে বি -এড পাশ করে এই ক্ষুদ্র স্কুলে কাজ নিয়েছেন ।

কারণ বাপের বাড়ি কাছেই । উনি তো একা মানুষ । আর কেউ নেই ওর । তাই শহরের বড় বড় স্কুলের লোভনীয় অফার ছেড়ে উনি এখানে ।

আসলে ওর বিয়ে হয়েছিলো নাকি , খুবই কম বয়সে । স্বামী ওকে ত্যাগ করেন ।

কারণ উনি স্বামীর চেয়ে বয়সে প্রায় দশ বছরের ছোট আর তখন মাত্র ক্লাস নাইন অবধি পড়েছিলেন । ওর পতিদেব তখনই পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে এম এ করেছেন ।

সারা দেশে ঘুরে বেড়াতেন উনি রাজনীতির কারণে । স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে চলে যান একদিন অজানা কোথাও । পরে আর বাড়ি আসতেন না । স্ত্রী শেষে বাপের বাড়ি চলে আসেন ।

পরে পড়াশোনা শেষ করেন এক এক ধাপ করে ।

ভালো ফল করেছিলেন সব পরীক্ষায় । একেবারে ফার্স্ট না হলেও প্রথম দশজনের মধ্যে ছিলো ওর নাম । পরে বেছে নেন এই একাকীত্বের জীবন ।

ভাইরা অনেক বলেছে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে । কিন্তু সুগন্ধা নিজ সিদ্ধান্তে অটল ।

চেহারা মিষ্টি । টিকালো নাক , পাতলা ঠোঁট । মাঝারি গায়ের রং । উচ্চতায় মাঝারি ।

নম্র ও বিনয়ী ।

সুগন্ধার স্বভাবের জন্যে সে ছিলো খুবই জনপ্রিয় । ছাত্রদের যাতে পড়াশোনা হয় , দরিদ্র বাবা-মা হয়ত সব সময় বাচ্চাদের স্কুলে পাঠান না , কোনো ছোট কাজে লাগিয়ে দেন, সুগন্ধা ওদের বাসায় গিয়ে ছাত্রদের ডেকে আনেন ।

ঈদের সময় ওদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে সিমাই ও নানান ভোজ খান ।

অনেকেই ওকে মা বলে । দিদিমণি নয় । সাদা কালো , জাতপাতের বাইরে মানুষ বা মনুষ্য সত্ত্বাটিকে চেনান । মুক্তমনা হতে ও যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শেখান । এই মায়ের আঁচল বিছানো সর্বত্র । পুরো গ্রামে । করালীতে ।

সুগন্ধার স্বামী জয়দেব গুপ্ত একজন একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী , জননেতা । জনপ্রিয় ।

মানুষের জন্যে অনেক কাজ করেছেন । এই বাংলায় উনি বহুদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আছেন । বাংলার তো অনেক উন্নতি হয়েছে । শিল্পে বাণ ডেকেছে । মানুষ খুশি ।

এখন উনি প্রধানমন্ত্রীর পদে সামিল হবার জন্যে চেষ্টা করছেন । কেউ কেউ সমর্থন করছেন কেউ বা বলছেন : এক বাংগালি

কো পি এম ? মাত পুছো । বহুৎ লেজি ক্লাস অউর ইগো হ্যায় ইৎনা !

এই নিয়ে টানাপোড়েন চলেছে আজ বেশ কিছুদিন ।

ভদ্রলোক উঠেপড়ে লেগেছেন যাতে প্রধানমন্ত্রীর কুর্শিটি দখল করতে পারেন ।

আর ওর শত্রুরা লেগেছে সুগন্ধার চরিত্র হননে ।

জয়দেব বাবু যেহেতু ওর স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন তাই উনি একা থাকেন । আর দারপরিগ্রহ করেন নি । কিংবা কোনো রক্ষিতাও নেই ওনার ।

চরিত্রে কোনো দাগ নেই । মানুষটি খুবই কঠিন কিন্তু অন্তরে কোমল । নারকোলের মতন । ভেতরে শাঁস আর বাইরের খোলস বেশ শক্ত ।

ঠিক এই সময় জয়দেব গুপ্তর জীবনীকার বা বায়োগ্রাফার, লেখিকা মুক্তা মুখোপাধ্যায় আসে করালী গ্রামে । ওর জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ অর্থাৎ সুগন্ধার সাথে আলাপ করতে ।

বহু গল্পকথা শুনে এসেছে সে শহর কলকাতায় । নানান কোণ থেকে । কেউ বলে সুগন্ধা কুলটা , কেউ বলে সে নির্মল ও ভোলাভালা । কেউ বা বলে সে খুবই সরল তাই জয়দেব ওকে

ঠকিয়েছেন । নানান কথা শুনে শুনে একটি মত গড়ে উঠেছে ওর সম্পর্কে ।

তা হল : সুগন্ধা যেমনই হোন না কেন জয়দেবকে নিয়ে তার কৌতুহল নেই বিন্দুমাত্র ।

এক সুন্দর, কচি লেবুপাতার মতন রোদ বিছানো শীতের সকালে মুক্তা এলো এই অচেনা গঞ্জ , করালীতে ।

করালী নদীর গা ঘেঁষে এই জনবসতি । মাত্র ১২০ ঘর মানুষ । ছানাপোনা নিয়ে গেরস্থদের বাসস্থান । একপাশে ঘন বন । লাল সোঁদা মাটি । অসংখ্য বুনোফুলের ঝাড় আর হাঁস মুরগী ।

গ্রামের মানুষ প্রায় সকলেই চেনে সুগন্ধাকে । মুক্তার কোনো অসুবিধে হলনা তাকে খুঁজে পেতে । বাদামী পাড় , ক্রিম রং এর তাঁতের শাড়ি । সাধারণ সাজ পোশাক । চুলে আলতো খোঁপা । কানে বিন্দু বিন্দু রূপার ফুল, অর্থাৎ একজোড়া দুল - দুই হাতে দুই গাছি করে ঈষৎ মোটা রূপার চুড়ি ।

প্রথম কথাই বললেন : আমি রূপো খুব ভালোবাসি । আর ভালোবাসি কাচের চুড়ি ও নানান রং এর টিপ । বেশ বড় বড় টিপ । আজকাল তো ভেলভেটের টিপ পাওয়া যায় । আগে আমি গুঁড়ো গুঁড়ো টিপ ব্যবহার করতাম । আমার এক মাদ্রাজী বান্ধবীর কাছে পেয়েছিলাম ।

সে হরেক রকমের বিন্দি । নীল, বেগুনি , কমলা, মেটে , তুঁতে , গোলাপী --- বলে এক গাল হেসে ওঠেন । ডান গালে একটি গাঢ় টোল লক্ষ্য করলো মুক্তা । বয়স হয়েছে কিন্তু খুব একটা ছাপ পড়েনি ওর চেহারায় ।

এত কথা বলার কারণ মুক্তার ওর চুড়ি ও দুলের দিকে বার বার তাকানো । মুক্তার স্বভাব আছে এরকম । লোক কে জরিপ করার ।

ভদ্রমহিলার দুই কামরার ঘর । একটি ঘরে উনি থাকেন ও পুজো পাঠ করেন । অন্য ঘরে রান্না ও খাওয়া । এক কোণায় একটি গ্যাসের উনুন ।

বলেন : আমার একটি সিলিন্ডারে প্রায় মাস তিনেক চলে যায় । গ্যাস কোম্পানি দয়া করে আমার কানেকশান কাটেনি । তবুও রয়েছে , আসলে এত কম গ্যাস কিনি যে ওরা বিরক্ত ।

বলে হেসে ওঠেন । সেই টোল ।

মুক্তা লক্ষ্য করে যে ভদ্রমহিলা গ্রামীণ হলেও ওনার একটি সহজ ও সাবলীলভাব আছে । উনি বেশ স্মার্ট , গম্ভীর , কথা বেশি বলেন না । তবুও হাসলে হাসি থামে না ।

মুক্তার সাথে আগেই কথা হয়েছে ফোনে ।

নিজের বাড়িতে ওকে বসিয়ে চা ও স্ন্যাকস্ দিলেন ।

মুচমুচে বিস্কুট , বেগুনি আর চা ।

মুক্তা বেগুনি খেতে খুব ভালোবাসে । বেশ রসিয়ে খেলো ।

এরপরে প্রশ্ন শুরু হল ।

উনি বললেন : আমাকে নিয়ে কেন লিখতে চাও ?

মুক্তা : আমি তো জয়দেব গুপ্তর জীবনী লিখছি । সেখানে আপনাকে নিয়ে একটি চ্যাপ্টার থাকবেই । আপনি তো ওনার স্ত্রী ।

ভদ্রমহিলা ক্ষীণ হাসেন । তারপরে বলেন : আমি একজন নারী হিসেবে বিবাহিত জীবনের সব আনন্দ পেয়েছি । যা পাওয়া উচিৎ । হয়ত আমরা একসাথে নেই । আমি চাই উনি প্রধানমন্ত্রী হন । উনি খুব ভালো করে দেশ শাসন করতে পারবেন । উনি তো পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়েছেন । যে অল্প কদিন আমার কাছে ছিলেন , আমাকে বলতেন : আমি খুব বড় নেতা হতে চাই । আর আমি মানুষের জন্যে কাজ করতে চাই । শুধু গলা বাজিয়ে ভোট আদায় করে নিজের ঘর গোছানো আমার অ্যাজেন্ডা নয় ।

আরো বলতেন : আমার মনে হয় ভারতের সব নেতা ও রাজনীতির মানুষ যদি ভালো করে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ে নেন ও তা বাস্তব জীবনে কাজে লাগান , আমরা এগিয়ে যেতে পারবো । বিরুদ্ধ পক্ষকে আমাদের রেস্পেক্ট দিতে হবে । ওদের সাথে লড়াই না করে ।

অপনেন্ট পার্টির নেতা , যাঁরা মেজারিটি না পেলেও বিরোধী হিসেবে থাকেন তাঁদের মতামত খুব ইম্পর্টেন্ট । নীতির নানান ভুল ভ্রান্তি ওরা শুধরে দেবেন ।

একটি কোনো লেভেলে আমাদের ভুলে যেতে হবে নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় । সমস্ত পলিটিক্যাল আইডিওলজি ভুলে দেশের জন্যে কাজ করতে হবে ।

ভারত আজ সংকটের মুখে । মানুষ হতদরিদ্র হয়ে বেঁচে আছেন । খাদ্য , জল, তেলের অনেক দাম । আমাদের এমন সমাজ গড়ে তুলতে হবে যেখানে সবাই ফুড, শেল্টার আর পরণের কাপড় থেকে বঞ্চিত হবেন না ।

এই পর্যন্ত বলে সুগন্ধা চুপ করে চা ঢালতে শুরু করলেন আবার টি পট থেকে ।

সাধারণ একটি সাদা টি পট । সাইজে বেশ ছোট ।

বললেন : আমাদের হেড স্যার খুব ভোজন রসিক । এখানে সস্ত্রীক আসেন খাবার খেতে ।

তাই এই টি -পটের ব্যবস্থা কারণ উনি প্রচন্ড চা পান করেন ।

এই টি-পট আমি কলকাতা থেকে এনেছি । সস্তায় । সঙ্গে চারখানি কাপ ও প্লেট দিয়েছে ।

মুক্তা কথায় ফেরে । আপনাদের বিচ্ছেদ হল কেন ?

সুগন্ধা ডুবে যান গভীর হতাশায় , এবার । মুখে হাসিটি আর নেই ।

- উনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওনার রাজনৈতিক কাজ কর্ম নিয়ে যে বাড়ি আসতেন না । শেষে একেবারেই আসা বন্ধ হল । তারপরে আমি চলে গেলাম বাপের বাড়ি । আমার বাপের বাড়ি এখানেই , কাছেই । বাবার খুব বড় দোকান ছিলো । শাড়ি কাপড়ের ব্যবসা । হোসিয়ারির ব্যবসা । আমার ভাইদের মধ্যে দুজনে ঐ ব্যবসা দেখে । অন্যজন বইয়ের ব্যবসা করে ।
আমাদের স্কুলের বহু বইপত্তর ওর প্রেস থেকে ছেপে বার হয় । কমলা প্রেস নাম । আমার মায়ের নামে নাম । আর এমনি বই, খাতা ও কলমও ওখানে থাকে ।
উনি আমাকে ছেড়ে চলে যাবার পরে আমাদের একটি সন্তান হয় । তাকে আমি কিছুদিন মানুষ করি । ওর যখন তিন বছর বয়স তখন এক বিদেশী দম্পতি ওকে দত্তক নিয়ে যান । মেয়েটি বাঙালী আর ওর বর সাহেব । ওদের দুটি সন্তান আছে । নিজেদের সন্তান । আরো একজনকে ওরা দত্তক নেয় । কারণ ওদের দুই মেয়ে । আর ছেলের জন্যে চেষ্টা না করে বাইরে থেকে এক অভাগাকে ঠাঁই দেয় ।
খুব বড় মাপের মানুষ ওরা । জানিনা ওরা কোথায় । তবে আমার সন্তান এখন বড় হয়ে গেছে । তুমি তো জানো , এক ভিনদেশ থেকে ওর নেতা হবার ব্যাপারে আপত্তি করা হচ্ছে ।

কারণ উনি একটু সমাজতন্ত্র আর রাজতন্ত্রের মেলবন্ধনে বিশ্বাসী । সেই দেশের যে বাদামী চামড়ার যুবকটি সবচেয়ে বেশি আপত্তি তুলেছে সেই আমাদের পুত্র মোহনভোগ ।
হ্যাঁ আমি ওকে মোহনভোগ বলে ডাকতাম ।
ওকে নিয়ে যাবার পরে বেশ কয়েক বছর ওর পালিত বাবা ও মা আমাকে চিঠি দিতেন । তখন এত কম্পিউটার তো ছিলো না । বছরে তিনখানা চিঠি আসতো । আমি পিওন আসার অপেক্ষায় কত দিন একমনে দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকেছি ।
পিওন বলতো : মা, আজ চিঠি নেই ।
তবুও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতাম । পরেরদিনও চিঠি নেই , জানি , তবুও আমি দরজায় ।
ঐ চিঠিগুলিতেই জানতে পারি ওর নাম ওরা রেখেছে ব্রুনো । আর ফ্লয়েড ডিলি হল ওদের পদবী । তাই পুরো নাম ব্রুনো ফ্লয়েড ডিলি । ওকে তো পেপারে দেখি লোকে ব্রুনো ডিলি বলে ডাকে । কিন্তু মাঝে একটি ফ্লয়েড ও আছে , জানো তো !

মৃদু হাসে এবার মুক্তা । ও অবাক হলেও তা ঢেকে রাখতে জানে ।
আর ও জানে ফ্লয়েডের ব্যাপারটা । আর এও জানে যে ওকে শর্টে লোকে বলে---
বি এফ ডি ।
এই ভদ্রমহিলা তো সবুজের মেয়ে । এত শহুরে কথকতা উনি জানবেন কি করে ?

যে মানুষ আজকাল আর রক্তমাংস নেই , সব অক্ষর হয়ে গেছে ! মানুষের শর্ট ফর্মই আজ লোকের প্রিয় । পুরো নামে কাজ কি ? মনুষ্যত্বের প্রয়োজনও একইভাবে ফুরিয়েছে ।

মুক্তা বরং বলে ---জয়দেব গুপ্ত কি জানেন ঘুণাক্ষরেও যে ব্রুনো ওর সন্তান ?

সুগন্ধা আর্তনাদ করে ওঠেন : না না , আমি ওকে বলিনি । আমি ওকে আর পেলাম কোথায় যে এসব বলবো ? তবে আমাদেরও কিছু রোমান্টিক মূহুর্ত কেটেছে ।

কালো দিঘীর পাড়ে ও মাছ ধরতে যেতো । একবার একটি আস্ত মাছ ধরে । কি বড় সাইজ তার । সেখানে চাঁদ উঠলে আমি ওর সাথে বসে থাকতাম । শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে । এইসব ঘটনা ক্ষণিকের যদিও । আজকাল ওকে আর ওর ছেলেকে আমি কাগজে দেখি , টিভিতে দেখি । বাবা ও ছেলে , একে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলে । আমি রক্তাক্ত হৃদয়ে দেখি । অনুভব করি অসম্ভব ব্যাথা । যেই ব্যাথা উপশমের উপায় আমার জানা নেই । আর এসব কাকেই বা বলবো ? আমার বাড়ির মানুষ ও বন্ধুরা জানে যে ও জয়দেব গুপ্তরই ছেলে । অন্য কাউকে বললে প্রমাণ চাইবেন । আমি কি করে প্রমাণ দেবো ? আজকাল শুনেছি কত শত পরীক্ষা হয় এসব নিয়ে । আমাদের সময় বাপু ওসব ছিলো না তো ।

ব্রুনো বা বি এফ ডি যাই বলো না কেন , উনি জয়দেব গুপ্তর প্রধানমন্ত্রী হবার পথে সব থেকে বড় কাঁটা । একটি বলশালী পশ্চিমী দেশের উনি মুখ্য মানুষ ।
বাদামী চামড়ার মানুষ । তবুও ওঁর কথায় অনেক কিছু রদবদল হয় । অনেক ঘটনা ঘটে ।
ব্রুনো নিজের মা কে তো জ্ঞান হবার পরে কোনোদিন দেখেনি । কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে তাঁর কথাগুলি মনে করে মুক্তার হৃদয়েও একটি ক্ষীণ বেদনার স্রোত বয়ে যায় ।
যদিও সে জানেনা যে ইনি ওঁর পিতা তবুও কেন যেন মনে হয় এত কঠিন ও শক্ত শক্ত কথা জয়দেব গুপ্ত সম্পর্কে যদি ব্রুনো আর না বলেন তাহলেই বোধহয় সবচেয়ে ভালো হবে ! আর সত্যি তো উনি তো জয়দেব গুপ্তকে চেনেন না । দেখেন নি । কেন যেন হঠাৎ মুক্তার খুব মনখারাপ লাগে ।

আস্তে আস্তে উঠে বিদায় নিতে চায় । বলে , পরে আবার আসবে ।

আরো কথা শুনবে , জানবে ।

সুগন্ধা বলেন : আমি ওকে তেমনভাবে তো কোনোদিন কাছে পাইনি কিন্তু কেন যেন আমার মনে হয় উনি সব সময় আমার কাছেই আছেন , কাছের মানুষ হয়ে ।
আমি যে কোনো কাজ করার আগে ওর ফটোর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করি । উত্তরও পাই ।

হয়ত উত্তরটা আমার অবচেতনে থাকে ! যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে তাহলে পরের জন্মেও আমি ওকেই স্বামী রূপে চাই । যদি উনি আমাকে আবার ত্যাগ করেন তবুও ।

আমি স্বাধীন । মুক্তমনা । কিন্তু এগুলি ওঁরই শিক্ষা। উনিই আমাকে ফ্রি থিংকিং করতে শিখিয়েছিলেন ।

-জয়দেব গুপ্তকে আজও ভালোবাসেন , তাই না ?

মিসেস গুপ্ত , হ্যাঁ আইনত ওদের বিচ্ছেদ তো হয়নি , নীরব থাকেন । দুই চোখের গভীর দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে উত্তর । বলেন : দুটি সমান্তরাল রেখা কি মেলে ?

আর মুক্তার চোখে ভেসে ওঠে খবরের কাগজের সংবাদগুলি । যেখানে জয়দেব গুপ্তকে ফেমিনিস্টগণ আক্রমণ করেছেন নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করার জন্যে ।

বলছেন : যেই পুরুষ , মেয়েদের অসম্মান করেন তিনি দেশ শাসনের উপযুক্ত নন ।

জয়দেব শুধু উত্তরে বলেছেন : আমার স্ত্রী ভালো আছেন , আমি জানি ।

নানা মানুষের নানান ইস্যু মনে পড়ে যায় মুক্তার ।

জয়দেব গুপ্ত ও তাঁর পত্নী সম্পর্কে মানুষ কত না কথা খরচ করে চলেছেন ।

আর পর্দার আড়ালে দুটি সত্ত্বা , নীরবে , একে অপরের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করছে যেন । সুগন্ধার প্রেম সুগন্ধে আতর এর অভাব

আর জয়দেব দেশের কুর্শি জিতে গেলেও প্রেয়সীর মনে আনন্দ স্ফুলিংগ সংযোগ করতে অক্ষম ।

এই দুটি ঘটনাই আজ চরম সত্য ।

শিকড়

সোনালী ভারী পর্দাটা সরিয়ে বড় বড় কাচের জানালা খুলতেই শীতল বাতাসে ঘরটা ভরে গেলো ।

পায়ে পায়ে টেবিল ল্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেলো মনিষা । এক কালের নামী টেনিস প্লেয়ার ।

মনিষা তালুকদার বিয়ের পরে হয় বর্মণ । মনিষা বর্মণ নামেই সবাই চেনে । বিয়ে করেছে এক প্রাচীন রাজ বংশের সন্তানকে । নাম মল্লার বর্মণ । এখন হোটেল ও নানান উপাদেয় খাবারের ব্যাবসায় নিযুক্ত । ওদের কোম্পানি বেশ নামী । বিদেশেও প্যাকেটে করে ভারতীয় খাবার পাঠায় ।প্যাকেটের ভেতরে একেবারে রাজকীয়ভাবে সাজানো ।

মল্লার খুব নম্র । এত বড় ব্যবসাদার হলেও তার একটুও অহমিকা নেই ।

স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে । দুই পুত্র । তারা বিদেশে পড়ে । বাবা মায়ের কাছে কম থাকে ।

মনিষা খেলার জগৎ থেকে অবসর নিয়ে রাজনীতিতে এসেছে । মল্লার বহুবার বারণ করেছে , মনিষা কর্ণপাত করেনি । তার কারণ সে মানুষের জন্যে কাজ করতে ইচ্ছুক । নিজ ক্ষুদ্র গন্ডীর বাইরে যে বিশাল চেতনার অনাগোনা , তাকে ছুঁয়ে দেখতে চায় । এতদিন নিজের কথাই কেবল ভেবেছে , আজ থেকে সবাই তার আপনজন ।

যোগ দিলো একটি নামী দলে । দাঁড়ালো ভোটে ।

কাজ কাজ আর শুধু কাজ । রূপসী মনিষা ওদের খেলার মাঠের সবচেয়ে গ্ল্যামারাস খেলোয়াড় ছিলো । লোকে ওর খেলার চেয়ে রূপ দেখতেই বেশি যেতো । এখন ও যতই কাজ করুক না কেন লোকে যেন ওকে দেখতেই বেশি ইচ্ছুক । ওর স্পর্শ নেশায় ছুটে ছুটে আসে গ্রামের মানুষ । ওকে একটু ছুঁয়ে দেখতে চায় ।

তবে ও কর্মঠ । খুব কাজ করে । আর বেশ সিরিয়াস । যা বলে তাই করে ।

নিজের তো অনেক সম্পত্তি । কাজেই এখন জনসেবায় সময় কাটায় । রাজনীতি ওর কাছে টাকা কামানোর রাস্তা নয় ।

দ্যাখে, মানুষ কত অসহায় । পথঘাট , স্বাস্থ্য , শিক্ষা সবেতেই মানুষের হতাশা ।

মাইলের পর মাইল জল ও ইলেকট্রিক নেই । পায়ে হেঁটে লোকে এক বালতি জল আনতে যায় । সেখানেও অনেক লোক । জলের রেশনিং হয় । অসুস্থ হলে চিকিৎসক নেই । বহু মানুষ মারা যায় বিনা চিকিৎসায় । আর বিজলী বাতি তো নেই-ই ।

মনিষা সব সমাধান করতে অক্ষম । কিছু কিছু বদলেছে ও জেতার পরে ।

ওর কাছে সবাই আসতে পারে । দেখা করতে পারে । ও ২৪/৭ লোকের সেবায় নিযুক্ত ।

ছেলেরা বিদেশ থেকে এলেও ও অফিস কামাই করেনা । ছেলেরা ক্ষোভ জানায় ।

এক পুত্র তো পাইলটের ট্রেনিং নিলো । মাঝে মাঝে বাড়ি এলে মা কে পেতো না । বিরক্ত হত । বলতো : স্টপ দিজ ননসেন্স মা । এসব পুওরগুলোকে দেখার অনেক লোক আছে । তুমি বাড়িতে থাকো আর আমাদের আদর করো ।

মনিষা হাসতো ।

ওর স্বামী মল্লার সাহেব দুজনের কথার ফাঁকে ফাঁকে ছোট খাটো উপদেশ দিতো । মা ও ছেলে দুজনেরই মন রেখে কথা বলতো ।

মনিষা মাসের অনেকটা সময় গ্রামে থাকতো। যেখান থেকে সে জিতেছে। লোকে ওকে মান্য করতো, ভালোবাসতো। কিন্তু এক বাঘাজী কোথার থেকে এলেন একদিন।

বাঘাজী ওর নানান কাজে বাধা দিতো। তাকে ও কোনোদিন দেখেনি। অন্যরা দেখেছে।

শিখদের মতন দেখতে। পাগড়ি আছে, আছে বড় বড় দাড়ি।

ইদানিং সে নাকি গ্রামের মেয়েদের জোর করে সতী করছে। কারো স্বামী মারা গেলে তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে অবশ করে দেওয়া হচ্ছে, তারপরে বাঘাজীর হুকুমে সে জ্যান্ত অবস্থায় চিতায় চড়ছে। কেউ কেউ নিজ ইচ্ছায় স্বামীর সাথে সহমরণে যাচ্ছে। বাঘাজীর নাকি ম্যাসকে দোলানোর মতন বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা আছে।

নিজের সম্পর্কে জোর গলায় বলেন : পিওপেল সে আই অ্যাম র‍্যাডিক্যাল ফর মাই থটস্।

এই আধুনিক যুগে এহেন পাশবিকতা মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছে।

বাঘাজী খুব বলবান পুরুষ আর ব্যাক্তিত্ব পূর্ণ চরিত্র।

মনিষার বিরোধীরা সুযোগ পেয়ে গেছে। ওকে কচুকাটা করার অপেক্ষা কেবল।

মনিষা ওর স্বামীকে এই বিষয়ে বলে । ওকে জানায় যে ডিটেলে আলোচনা করতে চায় । স্বামী মল্লার যেহেতু প্রাচীন রাজবংশের সন্তান তাই হয়ত ওর বিচার বিবেচনা ও লোক চরিত্র চেনার সহজাত ক্ষমতা ছিলো ।

মল্লার নিজেও এই খবর শুনেছে যে একটি লোক ঐ এলাকায় হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে নানান গোলমাল পাকাচ্ছে । পুলিশকে মনিষা এই ব্যাপারে তদন্ত করতে বারণ করে ।

মল্লার পরামর্শ দেয় যে : একটি মানুষকে সরিয়ে লাভ নেই । ঘটনার শিকড় খুঁজে বার করতে হবে ।

লোকটি এমনিতে নাকি খুব সহজ সরল । লোকের উপকারও করে । কিন্তু কেউ বিধবা হলে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলতে চায় । অনেকে ওর চক্রান্তে স্বেচ্ছায় যোগ দেয় ।

ভারতের মতন কুসংস্কারে ভরা হাজারও বেড়াজালের দেশে মানুষ অত সহজে রেবেল করতে পারেনা । অনেকেই নীরবে মেনে নেয় ।

অন্যায় হচ্ছে জেনেও । অন্যায়ের সাক্ষী হয়ে জীবন কাটায় ।

মনিষা লোকটির সঙ্গে কথা বলবে বলে জানায় । সরাসরি শত্রুতা না করে । এটা করে সে মল্লারের পরামর্শে ।

সদ্য বিমান চালকের লাইসেন্স পাওয়া পুত্রও বলে গেলো : মা তোমার রাজ্যে নাকি এক সাইকোর আমদানি হয়েছে ? মেয়েদের নাকি সে জ্যান্ত কবর দিতে চায় ! ইট্স্ জাস্ট ব্রুটাল অ্যান্ড ইটস্ সো রং !

মনিষা ও মল্লার দুজনেই হাসে । হেসে বলে : বাবু ওর থট প্রসেস ভিন্ন , আমাদের থেকে ।

আমরা ওর সাথে কথা বলবো ।

মল্লার খুব আজব মানুষ । কপালে রাজতিলক না থাকলেও সে যেন সত্যি সত্যি এক প্রজাবৎসল রাজা ! মল্লার সব সমস্যার গভীর ডুবে গিয়ে শিকড় সমেত নির্মূল করতে চায় ।

মনিষা খুব গর্ব বোধ করে ওর জন্যে ।

একবার ওকে সিকিমে এক ব্যাক্তি আক্রমণ করে । ও তখন টেনিস খেলতো । সেই মানুষটি ওকে বলে : আমি তোমাকে ভালোবাসি ।

মনিষা পরে জানতে পারে যে লোকটি এর আগে বহু সুন্দরীকে একই কথা বলেছে ।

পরে আবার দেখা হলে মনিষা প্রশ্ন করে : তুমি যে এত মেয়েকে প্রপোজ করো , ভেবে দেখেছো ঠান্ডা মাথায় যে এতজনকে ভালোবাসা আদৌ সম্ভব কিনা ?

লোকটি ভেবেছিলো মনিষা ওকে প্রেম নিবেদনের জন্যে ডেকে পাঠিয়েছে ওর হোটেলে । কিন্তু এরকম অদ্ভুত প্রশ্নে চমকে গেলো ।

বলে : কৈ না তো ! এগুলো নিয়ে তো ভাবিনি !

মনিষা বলে ওঠে : মনকে শান্ত করো । তুমি কাউকে ভালোবেসে হয়ত আহত হয়েছো তাই সব নারীর মধ্যে তাকে খোঁজো । কিন্তু তাকে আর পাবে না । পাবে হয়ত বা তার ছায়া ।

কাজেই অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব করে নাও ।

প্রেম কি আর বার বার হয় ?

লোকটির কিছু হয়ত মনে হয় । এরপরে আর তাকে খেলার সার্কিটে দেখা যায়নি । কোনো সুন্দরীকে ফলো করতে । এই শিকড় উপড়ে ফেলাও মল্লারের পরামর্শে ।

এবারও সেরকমই হল । বাঘাজীর সাথে দেখা করবে মনিষা ।

কিন্তু বাঘাজী বেঁকে বসলেন । উনি কোনো নারীর সাথে আলোচনা করবেন না ।

ওর মতে মেয়েদের ভোট দিতে দেওয়া উচিৎ নয় । দিলেও ওদের ভোট হাফ ধরা হবে ।

ওরা ঘরে বসে চুল্‌হা জ্বালবে , রান্না করবে , পুরুষের ফাই ফরমাশ খাটবে । এই পর্যন্তই । আর পতি পরপাড়ে গেলে তার বেঁচে থাকা বৃথা । কত লোক বিরক্ত করবে ! তার জন্যে সতীদাহই হল উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা । রাজা রামমোহনের কঠোর বিরোধী এই বাঘাজী । রামমোহন সম্পর্কে ওর বক্তব্য হল : এরকম কত পাগলই তো এসেছে , গেছে । আরেকটা ছিলো হিটলার । এরা মাঝে মাঝে ওঠে আবার নিভে যায় ।

আপাত দৃষ্টিতে শুনে মনে হতে পারে লোকটি পুরাতন পন্থী । কেউ বা ওকে উন্মাদও ভাবতে পারে । কিন্তু এর আড়ালে আছে এক অন্য কাহিনী ।

মনিষা সেই মল্লারের মহান উপদেশ মাথায় নিয়ে বসে আছে , ঘটনার মূল ধরে নাড়া দেওয়া ।

বাঘাজীকে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে মনিষার বাংলোতে । সরকারি বাংলো হলেও ভারি সুন্দর করে সাজানো । এসেছে বিমান চালক পুত্রও , সাইকোকে দেখতে ।

বাঘাজী সময় মতন হাজির । খুব পাংচুয়াল সে ।

বিরাট হলঘরের একপাশে টেবিল ল্যাম্প । ভারী পর্দা । আর ওরা চারজন ।

বাঘাজী চা ইত্যাদি পান করে বেশ খুশি মনে হল । আসলে মনিষার কাছে এই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয়ত আশা করেনি । মনিষা আর মল্লার অন্য ধাতুতে গড়া ।

ওরা সমস্যার শিকড়ে যায় ।

বাঘাজী মুখ খুললো । তখন সে পশ্চিমের এক দেশে ।

কাজ করতো একটি সরাই খানায় । দিবারাত্রি খাটতো । বিয়ে হয়নি তখনো ।

দেশে বাবা ভাই মা ইত্যাদি ।

সারাদিন কাজ করার পরে সে যেতো আড্ডা দিতে । ওখানে একটি মেয়েকে বন্ধু ভেবে দিনের নানান ব্যাথা অনুযোগ জানাতো । পরে দেখে বাকিরা সেসব জেনে গেছে ।

দু মাসে একবার যেতো চুল ছাঁটতে । সেখানেও একই ঘটনা । বিদেশে মেয়েরা সবার চুল কাটে - নারী ও পুরুষ ।

একটি হেয়ার ড্রেসারকে মনের কথা খুলে বলতো । পরে দেখে সবাই সব জানে ।

এইভাবে কয়েকটি জায়গায় প্রতারিত হয়ে তার বদ্ধমূল ধারণা হয় যে নারী মানেই গপ্পি ও পেট পাতলা । কাজেই কোনো সিরিয়াস কাজে ওদের নেওয়া চলেনা । নেওয়া অনুচিত ।

বাঘাজী বহুবার এদের হস্তে নাস্তানুবুদ হয়েছে , অকারণে । ওর দাদা এক মেয়েকে নিজের ইচ্ছেই বিবাহ করেন । সেই মেয়ে ছিলো ওদের থেকে নীচু জাতের । ওরা মেনে নেয় । ওকে এক ঘরে খেতেও অনুমতি দেয় ওরা । কিন্তু সেই বৌদি সংসারে ভাঙন ধরান । দাদা ওর জন্যে নিজের বাবাকে কোতল করে জেলে যান । ওর নিজের সহোদরা বিয়ে করে গুজরাটে । সেখানকার এক উকিলকে বিবাহ করে নিজেও বড় একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ আদায় করে । পরে সেই স্বামীকে ছেড়ে পালায় । অন্য কারো ঘর ভাঙে । আর বিধবা মেয়েদের নিয়েও ওর নানান কটূ মন্তব্য শোনা গেলো । ওর নাকি এই প্রজাতিকে নিয়ে চরম ভোগান্তি হয়েছে ।

বৃন্দাবনের ওদিকে কোথাও কোনো অচিন এক গ্রামে এরকম বিধবা দলের পদস্খলনের নানান গল্প সে শুনেছে ও চাক্ষুষ করেছে ।

স্বামী বেঁচে থাকলে তাও ঠিক আছে , বাবা কিংবা স্বামীর অনুপস্থিতিতে মেয়েরা একেবারেই অকেজো । কোথাকার কথা কোথায় গড়াবে , জল কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে !

আর পোশাকের তো আজকাল কোনো ছিরিছাঁদ নেই । স্বামীর পদমর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে কত ন্যাকা মেয়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধি করে সেও নিজে চোখে দেখেছে বাঘাজী ।

এইভাবে মেয়েদের দ্বারা আহত হতে হতে শেষে সে ঠিক করে সতীদাহ প্রথা চালু করায় ব্রতী হবে । রাজা রামমোহন রায় নেই । কিন্তু তাঁর তুলে দেওয়া প্রথা চালু করার মানুষের অভাব নেই । রূপ কানোয়ার যেমন সতী হয়েছিলো সেরকম এই মানুষটি বুকে অজস্র বেদনা নিয়ে বেঁচে আছে শুধু আরো মেয়েদের রূপ কানোয়ার নামক নারীতে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টায় । এবং এর জন্যে সে গর্বিত । অনুতপ্ত নয় ।

সে তার মতন করে সমাজ সংস্কার করছে । মেয়েদের ঘরে ঢুকিয়ে দিলে সমাজের ৭৫ শতাংশ সমস্যা নাকি মিটে যাবে । আর সতীদাহ আবার চালু করো ।

ধরো আর মারো ---ওরা অবলা নয় , বজ্জাত বালা ।বাঘাজির মতে ।

সমস্ত পুরুষের নষ্ট হবার পেছনে ওদের হাত । ওরা শুঁয়োপোকার মতন । একবার হাতে লাগলে জ্বালা করবেই । কারো নিস্তার নেই শুঁয়োর পরশ থেকে । শিউলি গাছের মতন মিষ্টি ফুলের গাছে ওরা লেগে থাকে । অর্থাৎ নির্মল পুরুষের বাহুডোরেও ওরা বিভীষিকা ।

এরকম আজব গল্প শুনে শিকড় সন্ধানী রাজতিলক বিহীন রাজা , মল্লার অবাক হয়না । মনিষাও অবাক হয়না কিন্তু এক ভয় ওকে চেপে ধরে ।

মল্লারকে ও পরে শুধায় :একে তুমি কি বলবে ? উন্মাদ নাকি ভিন্নমতের ধারক ।

মল্লার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে । তারপরে বলে : বাঘাজী হয়ত ফিল্ডে নেমে পড়েছেন কিন্তু সমাজে আরো অনেক বাঘাজী আছেন । তাই তো আমাদের দেশে মেয়েদের আজও এত করুণ অবস্থা । আমি তো এক পন্ডিতকে চিনি যিনি নিজের মেয়ের ১৫ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন এক জুতো ব্যবসাদারের সাথে ।

ওকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম : পন্ডিত মশাই , এত অল্প বয়সে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেন ।

তাতে উনি হেসে বলেন : আমার চারটে ছেলে , সবাই পড়বে । ও তো মেয়ে , ও ঘরে থাকবে । শুধু শুধু পড়ে সময় নষ্ট করে কী হবে ? অ আ ক খ তো শিখিয়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠাচ্ছি !

মনিষা পরে একদিন বাঘাজীকে শুধায় -- আচ্ছা, তুমি আমাকেও কি সতী করবে নাকি ? আমি উইডো হলে ?

বাঘাজী একগাল হেসে বলে : আর না না দিদিভাই কী যে বলেন ! আপনি মেয়ে নন । আপনি খুব ভালোমানুষ । তাই তো আজ নেত্রী হয়েছেন । মেয়েরা আপনার মতন হলে ঠিক আছে- কিন্তু ওরা সবাই এত মহিলা সুলভ , বজ্জাত , ন্যাকা ! ওরা খুব

জটিল গোত্রের প্রাণী । হিংসা , গসিপ এগুলি ওদের মজ্জাগত । ওদের মানুষ হতে হবে , তবেই সতী হওয়া থেকে নিস্তার পাবে । নাহলে বাঘাজী ওদের ছাড়বে না !

এর কিছুদিন পরে অবশ্যই আইনি হস্তক্ষেপে ব্যাপারটি বন্ধ হয় ।

নীল জরির মানুষ

শুভদা টেবিল ঘড়িটা ব্যাগে ভরে নিয়ে দরজা খুললো । কালকেই কিনেছে এই নতুন ঘড়িটা কিন্তু বিকল হয়ে গেছে । খাটের পাশে রেখেছিলো । সকালে ঘুম ভাঙাবার জন্যে ।

এমনিতেই মেলবোর্নে সকালে বেশ ঠান্ডা থাকে । ঘুম থেকে উঠে ওর স্কুলে যেতে ইচ্ছেই করেনা । তবুও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হয় । ও বাসে যায় । গাড়ি চালায় না ।

স্কুল প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে তাই অনেক ভোরে বেরোতে হয় । ফেরে দুপুরে ।

ওখানে ও ইতিহাস পড়ায় ।

বিদেশে পড়ানোর কায়দা বেশ ভালো । কাজেই ও উপভোগ করে । তা নাহলে ওর টিচারি একদম ভালো লাগেনা । ওর স্বামীর কারণে এই বিদেশে পাড়ি জমায় ।

উনি কম্পিউটারের মানুষ । আজকাল তো আই টির যুগ !

উনি অবশ্য বলেন : টিচার কথাটি ভালো না লাগলে বলবে : মেন্টর । তুমি নতুন কুঁড়িতে প্রাণ সঞ্চার করছো , কাজটা খারাপ লাগার কথা তো নয় ।

মিষ্টি হাসে শুভদা । ওর পুরনোকেলে নামটি নিয়ে লোকে অনেক মস্করা করেছে ।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাম থেকে ওর বাবা এই নামটি রাখেন । উনি শরৎ বাবুর ভক্ত ছিলেন । এখানে অবশ্য ও সুভা । সুভা বলেই পরিচিত । যদিও পাসপোর্টে নাম শুভদা ।

ওর স্বামীর নামটি বরং আধুনিক । দেবজিৎ । এখানে উনি ডেভ । সুভা ও ডেভ । ওদের একটি সন্তান । নাম গাগরি ।

ঘড়িটি নিয়ে সুপার মার্কেটে ঢুকলো । এই দোকানটি বিশাল । সবরকম জিনিস মেলে । বিরাট বিল্ডিং । বড় বড় নাম লেখা বিভিন্ন দিকে । কোথাও ইলেক্ট্রনিক্স , কোনোদিকে ফার্নিচার , কোথাও বা রকমারি ।

সুভা ওরফে শুভদা বাস থেকে নেমে জেব্রা ক্রসিং পেরিয়ে এলো মার্কেটে । ভেতরে ঢুকে কাউন্টারে জিজ্ঞেস করলো মিস্টার জাস্টিন রিভার কোথায় । ওর কাছ থেকেই কাল এই মূল্যবান ঘড়িটি কিনেছে একটি ল্যাপটপ সমেত । ল্যাপটপটি ভালই আছে । ঘড়িটি সমস্যা করছে ।

সদাহাস্যময়ী কাউন্টার কর্মী লিন্ডা হাত তুলে দেখালো : ঐ যে ঐদিকে আছেন । হি ইজ ওভার দেয়ার ।

হ্যাঁ , একটু দূরে লাল জামা পরিহিত মানুষটি । ফর্সা ধবধবে । শুধু মুখটা বাদ দিলে প্রায় উন্মুক্ত সারা দেহেই ওর ট্যাটু । গাঢ় নীল রংয়ের । নানান আকৃতি ও ডিজাইন । চামড়া প্রায় দেখাই যাচ্ছে না ।

ধীরে পায়ে এগিয়ে গেলো সুভা । মিস্টার রিভার এগিয়ে এলেন । ও নিজের সমস্যার কথা বললো । উনি বয়স্ক । বেশ বয়স্ক । আর ডিগনিফায়েড । কথাগুলি শুনে একটু হাসলেন । তারপরে বললেন : যন্ত্রটি আমি বদলে দেবো । বিকল হবার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী ।

মৃদু হেসে এগিয়ে গেলেন র‍্যাকের দিকে । সার দিয়ে নানা ব্র্যান্ডের ঘড়ি রাখা ওখানে ।

সুভা চেয়ে আছে । অন্য ক্রেতারা নিজ নিজ ভুবনে । বিরাট ঘর । প্রায় ৫০ টি আলাদা আলাদা কাউন্টার ও টেবিল । জাস্টিন কিছুক্ষণ পরে এগিয়ে এলেন । হাতে অন্য একটি বাহারি ঘড়ি । বললেন : এটা নিশ্চয়ই চলবে । গ্যারান্টি ।

তারপরে চোখ ছোট করে বললেন : না চললে একটি কফি, এখানে ফ্রি !

দোকানে কফির কাউন্টার আছে । সেখানে কফি ও বিস্কুট খাওয়া চলে । ওখানেই ফ্রি কফি খাবার অফার দিলেন ।

তারপর আবার বলেন : অবশ্য এবার ঠিক চলবে । কোনো প্রবলেম হবার কথা নয় ।

সুভা কথা বললো ; নীল আকাশের মতন একটি জামা পরেছে আজ । চুল খোলা । হাতে পুঁথির মালা জড়ানো । রং বেরং এর পুঁথি । কানে নীল ক্রিস্টালের দুল । লম্বা । বললো : এবার ঘড়ি না চললে আপনাকে আমার বাড়িতে যেতে হবে । নিমন্ত্রণ রইলো ।

এরকম অদ্ভুত কথায় একটু অবাক হলেন জাস্টিন । সুভা খোলসা করে বললো : আমার হাজব্যান্ড ও কন্যার সাথে আপনার আলাপ করাতে চাই । উনি উত্তরে হাসলেন ।

তারপরে : তা এইভাবে কেন ? আমি এমনিই যেতে পারি ।

সত্যি ওকে খুব আকর্ষক মনে হয়েছিলো সুভার । সেলসম্যানের মতন আদৌ নন । অনেক বয়স । হয়ত ৭০ হতেও পারে । খুব ব্যাক্তিত্বপূর্ণ ও সুগম্ভীর । প্রতিটি কথার ওজন আছে । সেলসের লোকেদের মতন বখাটে নন । প্রতিটি কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন । কেন এই লাইনটি কাগজে লিখলেন বা কেন এই স্কিমে নিলে কম দাম পড়বে প্রতিটি এত সুন্দর করে বোঝাচ্ছিলেন যে মনে হয় ওর সান্নিধ্য যেন না ফুরায় ।

সুভার বাবা ছিলো না কোনোদিনই । মা বিধবা । একা হাতে ওদের দুই ভাইবোনকে মানুষ করেছেন । কাজেই ফাদার ফিগারের অভাব চিরটাকালই ছিলো । ভেবেছিলো এমন কোনো মানুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে যে বয়সে অনেক বড় ও তাকে বাবার মতন রক্ষা করবে । কিন্তু ওর স্বামী ওরই বয়সী । কাজেই মনের দু:খ মনেই রয়ে গেলো ।

জাস্টিনের মধ্যে ও যেন পিতার ছায়া দেখতে পেলো ।

ভদ্রলোক একেবারেই ভিন্নধরণের । চেনা ছকের মানুষ নন ।

সুভার আমন্ত্রণ উনি ফেলতে পারলেন না । কাজেই স্থির হল পরের সপ্তাহে ওর বাড়ি উনি আসবেন । সকালে । কারণ

বিকেলে ওকে হাসপাতালে যেতে হবে । কোনো একটি চেক আপ আছে ।

সুভা নিজের ক্রয় করা বস্তুটি নিয়ে ফিরে গেলো । জাস্টিনও কাজে ডুবে গেলেন ।

কথা মতন উনি এক রবিবার সকালে হাজির হলেন সুভার বেগুনি ফুলের গাছ ঘেঁষা বাসায় ।

ওদের বাড়িটি একটু গাছে ঘেরা । বাগানটি অগোছালো । ওদের সময় হয়না গাছ ছাঁটার । কাজ কাজ আর কাজ । কাজ নিয়েই আছে দুজন । অবসরে মেয়েটিকে নিয়ে দূরে কোথাও ঘুরতে যায় । এই তো, সপ্তাহে একদিন মেয়েটি বাবা মাকে কাছে পায় ---শনিবার মায়ের ছুটি হলেও বাবা কাজ করেন । উনি খুব ব্যস্ত । শনিবার বাড়ি থেকে একটি ভিন্নদেশের ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করেন । কনসালটেন্সি ।

ওরা ঠিক করলো যে জাস্টিন এলে ওকে নিয়ে খেতে যাবেন দূরে কোথাও । তাহলে বেড়ানো হবে আর কথাও হবে ।

সময় মতন জাস্টিন এলেন । উনি খুব পাংচুয়াল । ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সকাল নটায় এলেন । পরণে আজ সাদা হাতকাটা এক শার্ট । সারা দেহে নীল ট্যাটু । নানান ডিজাইন , নানান আকার

। সাঁওতালদের উল্কির মতন । ছোট প্যান্ট । পা দেখা যাচ্ছে । মুখটা কেবল পরিষ্কার । কোনো ট্যাটু নেই ।

দরজা দিয়েই ঢুকতেই সবাই হেসে অভ্যর্থনা জানালো ।

উনি একটি ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছেন । হলুদ বড় বড় সুন্দর ফুলের স্তবক ।

ওদের প্রাণভোমরা মেয়েটির জন্যে চকোলেট । ওকে নিয়ে ওরা ড্রয়িংরুমে এলো । মেয়ে হেসে হেসে কথা বলছে । উনি ওর গাল টিপে আদর করছেন । হাসছেন ।

কথায় কথায় দিন গড়াতে লাগলো । দুই দফা চায়ের পাট চুকলে ওরা একত্রে বাইরে খেতে যাবার প্রস্তাব দিলো । ভদ্রলোক প্রথমে একটু নিমরাজি মনে হল । পরে উনি রাজি হলেন তবে বললেন : বেশি দূরে যাবো না , আমাকে আবার বিকেলে হাসপাতালে যেতে হবে চেক আপের জন্য । আসলে ওনার পৈটিক কিছু সমস্যা আছে তাই এখন একমাস ধরে প্রতি রবিবার চেক আপে যেতে হয় ।

ওরা ঠিক করলো যে কাছেই একটি ঝর্ণা আছে , কিলিবারো হিলসে ওখানে যাবে ।

ঘন বনের মধ্যে হিতাং নদী ও তার একটি অংশ কলস্বনা ঝর্ণা ।

সাদা ফেনিল জলরাশি ঝরে পড়ছে সবুজ বনভূমে ।

পিকনিক স্পট ও একটি মধ্যম আকারের রেস্তোরাঁ আছে । কাঠের বাড়ি । কাঠের গুঁড়ি দিয়ে চেয়ার ও টেবিল । অর্থাৎ লগ কেবিন । নামও লগ কেবিন ।

বাইরে অজানা পাখির কলতান । প্রজাপতির ঝাঁক । জাস্টিন খুব আনন্দিত । বলেন : আমি আগে এখানে আসিনি । এই জায়গার নাম শুনেছিলাম কিন্তু আসা হয়নি । আর ব্যস্ত মানুষ তো , সব জায়গায় যাওয়া হয়ে ওঠেনা । এই তোমাদের মতন বন্ধুর সংস্পর্শে এলে - কোনো কোনো জায়গায় যাওয়া হয় !

ওরা এখানে মেক্সিকান খানা খেলো । কয়েক ধরণের খাবার মেলে । তবে মোট ৫টি ডিশ হয় রোজ । এক একটি ফুল মিল । মানে একটি ডিশ অর্ডার দিলে সেটি খেয়েই পেট ভরে যায় । সাথে আলু চিপস্, স্যালাড , স্যুপ সব দেয় । অনেক আড্ডা হল । জানা গেলো জাস্টিন আদতে ভারতীয় । উনি বাঙালী ।

আসল নাম যতীন বাউড়ি । আদি নিবাস বাঁকুড়া । টেরাকোটার দেশ , লাল লাল মাটি , মাটির সব মানুষ , মল্লভূমি, তুং ভূমি , মুকুটমণিপুর , বিষ্ণুপুর ও মহুয়া মাদল ও ধিতাং এর দেশ ।

বাউড়ি মানুষেরা অত লেখাপড়া শেখে না।

আদি জনজাতি। তবে এই যতীন বাউড়ি কলকাতায় পড়েছেন। এক রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে থেকে। ভদ্রলোক গোঁড়া কংগ্রেসের মানুষ। উত্তর কলকাতায় একটি বিরাট চত্বরে ওর বেশ বড় বাড়ি। পেশায় ট্রাক ব্যবসায়ী। সেই বাড়ির আনাচে কানাচে আরো বাড়ি। সেখানে এইসব যতীন, কল্লোল, প্রসাদের মতন চালচুলোহীন মানুষেরা ঠাঁই পেতো।

বাঁকুড়া থেকে এক কাপড়ে ওখানে আসে যতীন। খুব মেধাবী ছিলেন। তাই ওকে অনেক দূর অবধি পড়ান সেই নেতা। নেতার বাড়িতে ম্যানেজারি করতেন উনি। পড়েন এম বি এ।

যতীন জাতে বাউড়ি হলেও ওর মা ছিলেন সাদা, হোয়াইট। জাতিতে আইরিশ। ভদ্রমহিলা এশিয়ার আদিবাসী মানুষের ওপরে বই লিখতে ভারতে আসেন। সেইসময় যতীনের দোর্দন্ডপ্রতাপ পিতা সুখরামের নজরে পড়েন। সুখরাম এলাকার মাতব্বর ছিলেন। উনি মল্লভূমির সার্থক মানুষ। কারণ দূর্দান্ত কুস্তিগীর। ওঁকে সহজে কেউ হারাতে পারতো না। তাই উনি নিদ্রা গেলে অনেকে প্রতিশোধ নেবার আছিলায় ওকে পুকুর কিংবা নদীর জলে অর্ধেক ডুবিয়ে রেখে আসতো।

জাস্টিন ওরফে যতীন বাউড়ির মা ইসাবেলার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায় সুখরাম ও তাঁর মিলন হয় । যতীন জন্ম নেন । কিন্তু আঁতুর ঘরেই ওর মা মারা যান । ওর চামড়া তাই এত সাদা । ওর জীবন কাটে পথেঘাটে , হাটেবাটে । বাবা ওকে স্বীকার করেন নি । পরে নেতার দাক্ষিণ্যে লেখাপড়া । বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পাশ । চাকরি করতেন বেশ বড় সংস্থায় । পরে ভিসা নিয়ে বিদেশে পাড়ি , সুখের নয় স্বস্তির সন্ধানে ।

বিয়ে করেন দেশে থাকতেই এক কায়স্থর মেয়েকে । ওদের কোম্পানির স্টেনো টাইপিস্ট ছিলেন । ভদ্রমহিলাও বেশ সুন্দরী । গ্রেসফুল । যতীন একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করে উত্তর কলকাতায় থাকতে শুরু করেন । স্ত্রীর নাম তপতী মিত্র ।এখন তপতী বাউড়ি ।

একদিন বেশ বড় একটি নার্সিং হোমে ওকে ম্যানেজার হিসেবে নেয় । ওদের সময় এত হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট , হোটেল ম্যানেজমেন্ট বিভাগ ছিলো না । উনি সহজেই কাজে ঢুকে যান । সেখানে অনেক সমাজের উঁচুতলার মানুষ ভর্তি হতেন । নানান বয়সের মানুষ ।

আলাদা কেবিন । ভালো পুষ্টিকর খাদ্য -----

এই এতখানি গল্প বলে উনি ঘুরে বসলেন । বললেন : একটু জল দেবে ?

এবার পরিষ্কার বাংলায় ।

এতক্ষণে ওর নাম হয়ে গেছে : নীল জরির মানুষ ।

বাচ্চারা দিয়েছে । মেয়ে আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা ।

সারা দেহে ওনার নীল ট্যাটু করা । ফর্সা শরীরে খুব চক্‌চক করছে । ঠিক যেন জরির ফিতে বসানো ।

ওরা নীল জরির মানুষ বলছে । ওরা ভাঙা বাংলা বলে । তাই এরকম এক নাম দিয়েছে ।

যতীন জলপান করলেন । অবাক জলপান । এক ঢোঁক করে জল পান করছেন । তাও সুভার ঢেলে দেওয়া জল আঁজলা ভরে পান করছেন । আজব মানুষ !

কথা বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে :: আমাদের কোনো সন্তান নেই । আমরা স্বেচ্ছায় কোনো সন্তান উৎপাদন করিনি । আসলে ঐ নার্সিং হোমে একদিন আগুন লাগে । যদিও ওটি দূর্ঘটনা কিন্তু আমার মনে হতে থাকে যে এরজন্য আমিই দায়ী । আমি তখন ম্যানেজার ছিলাম কিনা ! লোকে অনেক বললো , বোঝালো যে আমার কোনো দায় নেই এতে । কিন্তু মনে মনে আমি নিজেকে দোষী মনে করতাম । গিল্ট ।

তাই আমার মনে হতে লাগলো যে আমি পিতা হবার উপযুক্ত নই ।

কতগুলো নিরীহ মানুষের মৃত্যুর রক্তে আমার হাত রাঙা । আমি কারো পালক হতে অক্ষম । স্ত্রীর ক্ষোভ ছিলো । অবশ্যি

পরে সেও কিছুটা বুঝলো । কিন্তু সে মা হতে ইচ্ছুক । কান্নাকাটি করতো ।

কথায় কথায় বেলা পড়ে আসে । ওরা আস্তে আস্তে পা বাড়ায় নিজ নিজ স্মৃতির কোটরে । উনি বললেন কিছু ছবি দেখিয়ে পরে গল্পটা শেষ করবেন ।

সুভা হাসলো । বললো : ঠিক আছে , একটু সাসপেন্স থাকনা !

যাবার পূর্বে উনি বলে গেলেন : আমরা একলা , কিন্তু দু:খী নই ।

কথাটার অর্থ সুভা বুঝলো না । ভাবলো যে গিল্ট কেটে গেছে । গাফিলতি যে ওঁর নয় সেটা মনে বসে গেছে এখন ।

বেশ কয়েকদিন পরে ওদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ । ওরা সবাই গেলো । সামনে সবুজ বাগান সেরকম নেই তবে উন্মুক্ত মাঠ । সেখানে বাচ্চারা হুটোপাটি করছে । সুভাদের কন্যাও ওখানে খেলছে ।

যতীনের স্ত্রী খুব ভালোমানুষ । বেশ আলাপি । আলু পোস্ত করেছেন । পোস্তর বড়া । মুগের ডাল । নিজ হাতে । এখানে

বাংলাদেশী দোকান থেকে কিনে আনেন । ইলিশ মাছ , বাঘাবাড়ির অতীব সুস্বাদু ঘি ।

ওরা অ্যালবামে অনেক ছবি দেখালেন । সব নানান বয়সের বাচ্চাদের । তারা সবাই ওদের পালিত সন্তান । ভারতের নানা অনাথ আশ্রমে থাকে । কেউ কেউ নিজ পরিবারের সাথে থাকে , খুবই দরিদ্র । ওরা তাদের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিয়েছেন ।

যতীন বলে ওঠেন : আমি নিজে সক্ষম নই কিন্তু অর্থ যোগান দিতে তো পারি কি বলো ?

বলেই হেসে উঠলেন নীল জরির মানুষ ।

বললেন : বাবা মায়ের কাছে সব বাচ্চাই সমান । তবুও যদি জানতে চাও তো বলি একজন মুম্বাইতে আছে । ওর বাবা-মা লেবারের কাজ করে । খুবই দরিদ্র । আমি ওর দায়িত্ব নিয়েছি । ওকে এখানে আনবার প্ল্যান আছে । এবার ক্লাস টেন দেবে । ভালো রেজাল্ট করে ।

ওর নাকি এম বি এ করার ইচ্ছে । ভাবছি এখানে এনে পড়াবো এম বি এ ---টা ।

ভদ্রলোকের মুখ চোখ চক্‌চক করছে । নীল জরির মানুষ হাসছে । ভীষণ হাসছে । হয়ত গিল্ট , পাপবোধ কেটে দেখা দিয়েছে ফিরোজা আকাশ ওর গহীন মন-ক্যানভাসে ।

মিসেসও বললেন : ও মনে হয় এই ছেলেটিকে একটূ বেশি ভালোবাসে । ওর নাম আমজাদ । আমজাদ ফকির । আমরা ওকে আমো বলে সম্বোধন করি । খুবই নম্র ছেলে ।

ওর একটি অদ্ভুত দিক আছে । মুসলিম হলেও ওর বাবা মানে বায়োলজিক্যাল ফাদার নাকি নাস্তিক । মসজিদে যায়না । বলে : আমি সারাদিন খাটি আর রাতে বিছানায় শুয়ে আল্লা , ক্ষোদাকে ডাকি । আমার মনই আমার মসজিদ । এই তো ক্ষোদা শুনেছেন নাহলে আপনাদের মতন বড়ে আদমী আমার একমাত্র ছেলেটির দায়িত্ব নিতেন ? আমার মসজিদে যাবার কী প্রয়োজন জানিনা । তবে মাঝে মাঝে আমাদের দরগার উপাসক আসেন । ওঁর কথা শুনতে খুব ভালো লাগে । ইসলাম শব্দের অর্থ নাকি ভারি সুন্দর । সারেন্ডার , আত্মসমর্পণ ---নিজেকে পবিত্রতায় নিবেদন করা , অপার শান্তি ।

এগুলি শুনলে আমার বেশ ভালোলাগে । তাই ওঁর ভাষণ শুনতে যাই আর রাতে শান্তির নিদ্রা দিই ।

নীল জরির মানুষকে সুভা জিজ্ঞেস করেই বসলো : চারিদিকে মুসলমানদের নিয়ে ভয় । ভাবনা । আর আপনি একটি মুসলিম ছেলেকে দত্তক নিয়েছেন ? খুব সাহসী তো আপনি ।

নীল জরির মানুষ বলে ওঠেন দৃঢ়স্বরে : ও কোথায় যাবে ? আমিও তো একদিন এইভাবেই কারো আশ্রয়ে এসে ঠাঁই

পেয়েছিলাম তাই আজ এই বিদেশে থিতু হয়েছি । হয়ত তখন কেউ কেউ ভেবেছিলো আমার কথাও : এই ছেলের সমাজে পরিচয় কী ? একে কেন এই ব্যাক্তি আশ্রয় দিলো ?

তাছাড়া ও অমৃতের সন্তান । আমার কাছে ওর কোনো বিশেষ ধর্ম নেই । আমার কাছে ওর ধর্ম মানবতা, সহনশীলতা । আমি কারো সম্পর্কেই জাজমেন্টাল নই । ডোন্ট জাজ পিওপেল । সবাইকে নি:শ্বাস নিতে দাও আর আইনকে তার নিজপথে চলতে ।

আমি মানুষের মন দেখি , প্রসাধন ও মেকআপ নয় ।

ফিরোজা আকাশের বেলাভূমি থেকে ফিরে আসছে সুভারা । একটি আইভিলতা লাজে নম্র । পথপাশে । ফিরোজা আকাশ ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে ।

শেষ সময়টুকু শুধু ছিলো নীরবতা । আর বিশাল বৃক্ষের ছায়ায় বাস করার স্বস্তি । যেই ছায়ার কথা আজন্ম কাল ভেবে এসেছিলো পিতাহারা এই মেয়েটি ।

কথা হারিয়ে গিয়েছিলো । যতীন বাউড়ির মতন মানুষেরা নক্ষত্রে বাস করেন । তাই সুভার কাছে তাঁরা পিতা নন , আদর্শ । মহামানব । ওদের দুজনের ভুবন পৃথক । জাস্টিন রিভার ঠিক যেন বিশাল এক নদী । সমুদ্র এই নদীর গন্তব্য নয়

। এর চলার পথে আছে অসীমের হাতছানি । জলরাশি অসীমে মিশে গেছে ।

যতীন বাউড়ি অন্য ভুবনের সন্ধানে আছেন । মিল্কিওয়ে ভ্রমণে যান ।

সুভা মর্ত্যের মানুষ । তাই দুটি পথ সম্পূর্ণ আলাদা ।

সমান্তরাল দুটি বিশ্ব, প্যারালাল উইনিভার্স কি কখনো মেশে ?

এরপর ওদের আর দেখা হয়নি । ভদ্রলোক কয়েকবার মেসেজ করেছেন । ও উত্তর দেয়নি ।

শেষে ওঁর দৃষ্টি এড়াতে ওরা অন্য শহরে চলে গেছে । একটি মেসেজ করে বলেছে : আমরা এখন ডেলাকোভায় থাকি । অনেক দূরে ।

উত্তর এসেছে : এদিকে এলে দেখা কোরো নিশ্চয়ই ।

নিয়ম মতন উত্তর গিয়েছে : ওকে । উইল ক্যাচ আপ লেটার ।

লাল গাছ

অনেকদিন আগে আমি , মিস মৌটুসী সাহা বেড়াতে যাই উত্তর পূর্ব ভারতের এক গহীন পাহাড়ি অরণ্যে । বেড়াতে গিয়ে ঐ জায়গার প্রেমে পড়ে যাই । পরে ওখানে গ্রামীণ এক ব্যাঙ্কে ,অফিসার হিসেবে যোগদান করি । সেখানে দিনশেষে রাঙা মুকুল না পেয়ে পড়শী মুকুল মন্ডলের পরিবারের সাথে মেলামেশা করতাম । ওর ভাই বেণুর বিয়ের সময় আমি নিজের গহনা দিয়ে মুকুলের স্ত্রী আরতিকে সাজাই । আমার মায়ের পুরনো কানপাশা ওকে পরাই , কাঁকন ও গলার কড়ি হার । বেশ মিত্রতা হয়ে যায় ।

টুকাই মানে ওদের মেয়েকে আমার কাছে রেখে ওরা অনেক বেড়িয়েছে । হরিদ্বার , বেনারস, রাজস্থান ইত্যাদি । এমন কি কাশ্মীর অবধি ।

মুকুলকে শুধাই : গোলাগুলির ভয় নেই ? কাশ্মীর কেন দাদা ?

মুকুল মুখটা বিকৃত করে বলে ওঠে : আরে আজকাল সব জায়গাই বোমাবাজি হচ্ছে । ঘরের ছাদ ভেঙে পড়েনি এই যা ! নিরীহ কাশ্মীর আর কি দোষ করলো ?

এই বন্ধু ও বন্ধুপত্নী --মুকুল পরিবারের কাছেই ঐ গল্প শুনি যা এখানে ব্যক্ত করবো মনস্থ করেছি ।

গল্পটি এক সাহসী , বলবান পুরুষকে নিয়ে যাকে এরা অনেকেই লালগাছ বলে ডাকে ।

আসল নাম বাদল ঠাকুর । ভদ্রলোক এখানে দুটি স্কুল পরিচালনা করেন । দুটিই নারীদের নিয়ে । লোকে ওকে মেয়েদের রক্ষক হিসেবে দেখে । ওরা লালগাছ নাম দিয়েছে ওঁর কারণ উনি আদতে ছিলেন কমিউনিস্ট । মেয়েরা ওকে বাবাঠাকুর বলে ডাকে । বাবা প্লাস ওর পদবী ঠাকুর । আদি বাড়ি রাজস্থানে হলেও ওদের ঠাকুর পরিবারের কয়েক পুরুষ বাস করতেন কলকাতার কাছে এক শহরতলিতে । ওর পূর্বপুরুষ হয়ত তখন কলকাতায় পাড়ি দেন সম্ভবতঃ বাংলার সমৃদ্ধির কারণে । বেশ কিছুকাল ওরা সেখানে বসবাস করেন । ওখানে বেড়ে ওঠেন বাবাঠাকুর । শহরতলিতে , ফাটাফাটি কাটায় জীবন ।

মুকুল মাঝে মাঝে আমার ব্যাঙ্কে আসতো টাকা তুলতে ও নানান স্কিমে টাকা ঢালার ব্যাপারে শলা পরামর্শ করতে ।

ওর একটি পালিত পুত্র আছে । সে জাতে ভুটিয়া । শিলিগুড়ি থেকে ওকে আর একটি ভুটিয়া কুকুরকে নিয়ে এসেছিলো মুকুলেরা । ছেলেটি আবার নাক চ্যাপ্টা বলে হীনমন্যতায় ভুগতো । মুকুল ও অন্যান্যদের নাক চোখা আর ওরটি কেমন ভোঁতা । শেষকাল পাশের পাড়ার রামলীলা যাত্রা করা অভিনেতা টঙ্কার বাথান ব্রহ্ম ওকে একটি ফলস নাক তৈরি করে দেন । যেটি এঁটে ও বাইরে যেতো । তাতে ওকে দেখে মনে হত যে ও মুকুলদেরই মতন । নাকটি হাতছাড়া করতো না যেমন মুকুল করতো না তার হুঁকো ।

ওকে মুকুলেরা ডাকতো কালে বলে । কেন তা জানা যায়না ।

কালে কিন্তু হুঁকোমুখো হ্যাংলা নয় । নয় সে কালো । ধবধবে ফর্সা । তার হাতে একটি দাপুটে ফলস নাক এলেও নাম বদলানো গেলোনা । নিজেকে ও পরিচয় দিতো বাইচুং ভুটিয়া বলে । কালে নামে ও খুশি নয় ।

একদিন ব্যাঙ্কে মুকুল আর কালে এলো । তবে কাজে নয় , স্রেফ রাতে নিমন্ত্রণ । ভুড়িভোজের । রাতে ওদের বাড়ি খাওয়া । কষা বনমূর্গার মাংস আর ভাত ভাজা । সুজির কেক । মিষ্টি বলতে কালোজাম গোছের কিছু একটি ।

সেদিন বাবাঠাকুরও ওদের বাড়িতে এসেছিলেন । কাছ থেকে এই প্রথম দেখলাম আমি । মেনু নাকি ওর ফরমাইশি । উনি এগুলি ভালোবাসেন । হুকুম করেছেন রান্না করতে ।

কালে অর্থাৎ বাইচুং দেখলাম ওর সান্নিধ্যে খুবই স্বচ্ছন্দ । ওকে : বাইচুং বলেই উনি ডাকছিলেন ।

আমার অবশ্যই কথা বলার সাহস হয়নি । আমি এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম ।

উনি যাবার সময় আমাকে কাছে ডেকে বললেন : মাথা নিচু করে কি এত ভাবছো ? আনন্দ করো । উল্লাসে মেতে ওঠো । এই তো বয়স তোমাদের এখন । আমি কলকাতায় অনেকদিন ছিলাম । রসেবশে ছিলাম । হা হা হা হা !

ওঁর হাসির তালে তালে অন্যরাও হাসছিলো । যেন রাজা ও তার পারিষদ । ভদ্রলোকের একটি গাম্ভীর্য ও ব্যাক্তিত্ব আছে যা অনস্বীকার্য ।

সেই আমার বাবাঠাকুরকে প্রথম দেখা ।

পরে মুকুলের কাছে শুনেছি যে উনি বলেছেন : মেয়েটির মানে আমার চোখে আগুন আছে ।

বাবাঠাকুরের অন্য একটি পরিচয় যে আছে আগে বুঝিনি । এখানে স্কুলের সাথে সাথে উনি একটি মিষ্টান্নের দোকানও চালান । দোকান বলা ভুল হবে , হলদিরামের মতন অনেকটা , একটি ফ্যাক্টরি । সেখানে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে মিষ্টি তৈরি হয় । নানান নতুন নতুন মিষ্টি ওখানে জন্মগ্রহণ করেছে । বাবাঠাকুরের কর্মচারীরা কিংবা উনি নিজেই যেগুলির জন্ম দিয়েছেন ।

যেমন হাতিবীণা ,কড়ি মখমল , গুড়িয়াগোল্লা , লালকমলপিঠা , বটকৌড়ি নাম ।

সম্মানিত, শ্রদ্ধেয় বাবাঠাকুরের দু-একটি বুঝি শত্রুও আছে-এলাকায় ।

একজনের নাম হিতেন । হিতেন জাট্টা । সে আবার মদ্যপ । দিনের বেলায় মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে । রাস্তায় পড়ে থাকে ।

ও একদিন আমাকে বললো : এই যে বাবাঠাকুর আছে না ও আসলে গুন্ডা ছিলো জানো তো !

হিতেন আমার ব্যাঙ্কে । হঠাৎ । পিতা ধনী ব্যবসাদার । অকালে প্রাণ রেখেছেন । বাড়িতে বৃদ্ধা মা । হিতেন মাঝে মাঝে বাবার জমানো টাকা তুলতে আসতো । সেদিন এসেই আমাকে একটি এগরোল খেতে দিলো । আমাকে ও মিস ক্যালকাটা বলে ডাকতো ।

বাঁকা হাসি হেসে বললো : এই যে মিস, শুনলাম বাদলাগুন্ডার সাথে তোমার মোলাকাৎ হয়েছে মুকুল কুত্তার বাড়ি।

আসলে মুকুল এই এলাকার সবার মতই বাবাঠাকুরকে শ্রদ্ধা করতো। তাই ওকে পা চাটা কুত্তা বলে সম্বোধন করলো হয়ত , মোদো মাতাল হিতেন।

বল্লো : ও শালা একটা কুত্তা আছে। বাদলা গুন্ডার পা চাটা কুত্তা।

সবার নয়নের মণি , এলাকার সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু পরিবারের, মহামানবকে গুন্ডা বলার কী কারণ থাকতে পারে স্রেফ ঈর্ষা ছাড়া ?

এরকমই ভেবে নিয়েছিলাম আমি। কলকাতায় ছিলাম। মানুষ কম মুখোশ বেশি দেখতে অভ্যস্থ। কাজেই আমি দ্বিধায় নেই আর।

মতামত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম মুকুলের গল্প শোনার পরে।

তবে এঁকে মহামানব বলা যায় নাকি গুন্ডা বদমাইশের পর্যায়ে ফেলা যায় সেই বিচার করবেন পাঠকেরা। আমি নই। আমি গল্প বলতে বসেছি।

শীতের কলকাতা। শহরতলি থেকে কলকাতার মূল কেন্দ্র বেশি দূরে নয় যেখানে বাদল গুন্ডার বাস। রাজনৈতিক মত হিসেবে সে বামপন্থী। বাম সরকার শাসন করছেন রাজ্য। ভালো মন্দ মিলিয়ে চলছে কাজ। মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থনীতি বিশারদ জ্যোতিরাদিত্য গুপ্তকে সবাই শ্রদ্ধা করেন ওঁর ব্যাক্তিত্ব ও আভিজাত্যের জন্য। উনি অক্সফোর্ডে পড়েছেন।

আর বাদলের ভয়ে মানুষ থরহরি কম্পমান। বাদল ঠাকুর। এই বাদল গুন্ডা অসীম সাহসী। ঠিক কী ধরণের কুকর্মে সে লিপ্ত ছিলো কেউ জানেনা। নানা মানুষ নানা কথা বলতো। তবে সাধারণ মানুষ ওর যে স্বভাবকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করতো তাহল ওর নারীদের প্রতি আসক্তি ও তাদের চরম অবমাননা। যেই এলাকায় সে থাকতো সেই তালদিঘীপুর এলাকার কোনো পাড়ায়, কোনো মানুষ বাড়ি ভাড়া নিতে চাইতো না। যদি তাদের একটি কন্যা থাকতো। অবশ্যি বৌরাও বাদ যেতো না। বাদল গুন্ডা নাকি অবিবাহিতা মেয়েদের জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে ভোগ করতো। কেউ ওর বিরুদ্ধে গলা ফাটানোর সাহস পেতোনা। এতই ওর পাওয়ার, ওপর মহলে চেনাশোনা।

নগ্ন নারীকে নিজ উরুতে বসাতো , পথের ধারে । বলতো : মহাভারত এগুলি শিখিয়েছে আমাদের ! দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলবে । ওকে সতীলক্ষ্মীর সার্টিফিকেট কে দিয়েছে ? আরেকটা হল কুন্তী ! বিয়ের আগে বাচ্চা হল ----এগুলি সব কটা বেশ্যা ।

অনেক মহিলাই তাদের জানালার পর্দা সরিয়ে বাদল গুন্ডাকে তাদের নির্জন নগ্নতা উপভোগ করতে দেখেছে ----- খোল, খোল না , পুরোটা খোল , আমি খাবো , আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে , বাংলায় কি যেন বলে : চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় !

বলে গায়ে জ্বালা ধরানো হি হি হাসি দিতো ।

মেয়েরা সরে যেতো না । বলা ভালো পারতো না । কারণ উল্টো দিকে বাদল গুন্ডা । দরজা ভেঙে ঢুকে পড়তে পারে । বাড়ির মানুষ এরপরে নিঁখোজ হতেও পারে যদি কোনো মেয়ে ওর ভোজনে ব্যাগড়া দেয় । নিজ হাতে এক এক করে পোশাক খুলে ফেলতো মেয়েরা , বৌরা ।

বাদল গুন্ডার লাল জবার মতন চোখ , উপভোগ করছে নারীদেহের স্নিগ্ধতা । পবিত্রতায় থাবা বসাচ্ছে । অকারণে , অচিরেই ।

এহেন বাদল গুন্ডা একদিন পলায়ন করে । এলাকা থেকে । সবে সরকার বদল হয়েছে । নতুন সরকার এসেই পুলিশকে হুকুম দিয়েছে : গো অ্যান্ড ক্যাচ দা বাস্টার্ড ।

বাদল রুট বদলে সোজা এখানে । এখানে এসে নাকি প্রথমে সাধারণ মানুষের মতনই থাকতো । একটি মারোয়ারি দোকানে সুপারভাইজারের কাজ করতো । দোকান মানে গুদাম ।

মারোয়ারি ব্যাক্তি হয়ত জাত ভাই বলে ঠাঁই দেয় । পরে হঠাৎ-ই একদিন ওখানে এক তান্ত্রিকের আবির্ভাব হয় । এইস্থানের কাছেই আছে মহাকালীর মন্দির । শ্মশান । কাজেই বহু তান্ত্রিক আসেন । লোকে তন্ত্র মন্ত্রকে ভয় পায় ।

এই তান্ত্রিক এসেই উঠতি বয়সের মেয়েদের ধরে নিয়ে যেতে লাগলো । তার সাধনার জন্য ।

মেয়েদের পিরিয়ডের সময় যে রক্তক্ষরণ হয় তা নাকি অতি শুদ্ধ । সেই রক্তে লাল কাপড় চুবিয়ে সে সাধনা করে , সিদ্ধিলাভের আশায় ।

কারণ-পান আর নির্মল মেয়েদের রক্তপান - একসাথে চলতো । পিরিয়ডের শুদ্ধশীল বস্ত্রখন্ড থেকে নির্যাস নিঙরে নিয়ে নিশিকালের এই হোরি খেলায় মেতে উঠতো ।

এই রাজ্যে যেহেতু লোকে তন্ত্র-মন্ত্রকে খুব ভয় পায় ও এই সমস্ত কার্যকলাপ দিয়ে সহজেই মানুষকে ভয় দেখানো চলে তাই কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেতো না।

পুলিশও চুপ মেরে গেছে। বাবাজীদের ভয়ে। যদি বাণ মারে !

সেইসময় নাকি সমস্ত মানুষকে রক্ষা করে এই বাদল গুন্ডা। একদিন অমাবস্যার রাতে ওঁৎ পেতে থাকে সে। তারপর পুজো শুরু হতেই সদলবলে হানা দেয় ঐ তান্ত্রিকের ডেরায়।

পাহাড়ের নিচে একটি প্রাচীন বটের ধারে মন্দির। উন্মুক্ত চাতাল , আর কিছু খড়ের চালা। ওখানে মেয়েরা - গুটিয়ে , ত্রস্ত , লাজে নত। আর অন্যপাশে কাপালিক। পুজোয় বসেছে। সিদ্ধিলাভের নেশায় মত্ত। পদ্মবনে মত্ত হাতির মতন।

সিদ্ধিলাভের জন্য, প্রাচীন ধর্মীয় পুঁথিতে চরিত্র শোধনের কথা বলা আছে নাকি বাহ্যিক নানান অনুষ্ঠান ও আচারের, বোঝা যায়না।

টকটকে লাল চোখ তার , জটাজুটো , লাল পোশাক ও বলিষ্ঠ গড়ণ।

বাদল গুন্ডা প্রথমে ভদ্রভাষায় মেয়েগুলিকে ছেড়ে দিতে বলে । কাজ হয়না । তখন তান্ত্রিকের সাথে ওর মল্লযুদ্ধ হয় ।

কঠিন স্বরে সে বলে ওঠে : কোথায় তোর ঠাকুর ? ডাক ওকে , ডাক , ডাক দেখি , এই বাদল ঠাকুরের সামনে দেখা দিক ! যাকে দেখা যায়না তার জন্য এতগুলো নির্মল মেয়েকে এনে তুই এইভাবে অত্যাচার করছিস আর তোর মাকালী চুপ করে দেখছে ? মা কালী মেয়ে নাকি হিজড়া রে ? তোর মা কালী ল্যাংটা কেন রে ? এ্যাঁ ? তোর মাকালী কি ভাড়া খাটে ? রেট কত ? নাকি ফ্রিতে দেয় ? তারপরে বজ্রগম্ভীর কন্ঠে , পুজোর থালায় সজোরে পদাঘাত করে বলে ওঠে বাদল গুন্ডা ---

আমি কমিউনিস্ট , আমি এসব পুজো ফুজো মানি না ! এগুলি বুজরুকি , লোক ঠকানো আচার । ডাক তোর মা কালীকে ! ও এত কালো , শিব ব্যাটা ওকে বিয়ে করলো কী দেখে ? দুগ্গাটা বরং সুন্দরী । বেশ ডাগর ডোগর শুধু একটু রেগে থাকে । সবার ওপরে শালী খচে বোম ! অসুরগুলোকে পটাপট মারলো ! যদি পেতাম ! উহ্ ! ওকে কয়েক ঘা দিয়ে দিতাম ।

নানান দেবদেবী ও মা কালীকে যথেচ্ছ গালাগালি শুনতে হয় -- বাদলের কারণে । গুন্ডার বুলি, মধুর বচন তো নয় । তবুও মাকালী তো সবার মা । ডাকাতের মা , সাধারণের মা আর অসাধারণেরও মা । মা সহনশীল --- আমরা রেগে যাই , লড়াই করি কিন্তু ঈশ্বরের গায়ে কি কিছু লাগে ? আমরা রাহু , কেতু ও শনি ঠাকুরকে কতনা কটু উপাধিতে ভূষিত করি কিন্তু

ওঁনারা কি আর আমাদের সাথে বিবাদ করেন ? বরং বিনম্র চিত্তে পুজো দিলে আমাদের আশীর্বাদ দেন । সবাইকে গ্রেস দেন -যে যত বড় পেয়ালা আনে তত গ্রেস ভগবানেরা দেন । মা কালী তো জগতের আদি শক্তি , কসমিক এনার্জি ! সমস্ত সৃষ্টির মূল রস--- যিনি না থাকলে সম্ভব হতনা আপনভূমে পদচারণা ! জীবন্ত হতনা জীবজগৎ । ম্যানিফেস্ট হতনা এই মায়াভূমি । উল্টোদিকে কাপালিক কারণ -পান করে অর্ধ মাতাল । কোনো উত্তর আসেনা । মল্ল যুদ্ধে হেরে গেছে সে । যুদ্ধ শেষে জয়ী বাদল মেয়েদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে । কাপালিক পলায়ন করে ।

সেই থেকেই বাদল গুন্ডা পরিণত হয় বাবাঠাকুরে ।

--- কারো কাছে মন্দ কেউ বা বলেন ভালো । এই নিয়েই তো জগৎ , ভাঙা আর গড়ার খেলা । কোথাও ঢেউ কোথাও বা সবুজ স্নিগ্ধ বনভূম । সবাই সবার কাজ করে যাচ্ছে । আমরা প্রত্যেকেই নাটকে নানান চরিত্রে অভিনয় করছি , প্রতিনিয়ত । ডাকাত , তস্করেরাও ওদের কাজ করে চলেছে । নিজ রুটিরুজির জন্য । ওটা ওদের ধর্ম !

বাংলায় হয়ত দস্যু রত্নাকর কিন্তু এই এলাকায় উনি নমস্য । ঋষি বাল্মিকী । আর যজ্ঞের আগুনে পুড়ে যিনি নবরূপ পেয়েছেন উনি টেরাকোটা । আরো সুন্দর । আরো ভাস্বর ।

আমার তাই ওকে বাবাঠাকুর ডাকি । দেখবে একই মানুষ কারো কাছে ঘৃণ্য । কারো কাছে আদরণীয় । আমার মনে হয় সবাই যদি সুযোগ পায় নিজেকে খোঁজার হয়ত টেরাকোটা হয়ে আবার আবির্ভূত হবেন লোকসমাজে । অন্য ঊষায় , প্রথম আলোয় ।

মন্দ মানুষ থেকে হবেন গন্ধর্ব । তারপরে দেবতা ।

আমাদের এখানেই তো ছিলো স্বর্ণখনি ! এখন তা পরিত্যক্ত খনি , এলাকায় আছে আজও । সেখানে খুঁজলে আজও সোনা মেলে ঐ খনির মাটিতে । বাবাঠাকুর নাকি একবার ওখানে সোনা সন্ধানে যান । প্রথমে শুধু টুপি, সিগারেট এর পোড়া অংশ ও প্লাস্টিক খুঁজে পান । পরে অল্প সোনা । কিন্তু সেই সোনা আমরা সবাই দেখেছি । স্কুল ফান্ডের জন্য উনি দান করেছেন সেও লোকে দেখেছে । এরপর আর পরীক্ষা নেবে ?

যাঁরা মুক্তির পথে পা বাড়ান তাদের আর এত পরীক্ষা দিতে হয়না শুধু কিছু রক্তমাংসকে সন্তুষ্ট করার জন্য । খাদে পড়ে গিয়েও যাঁরা উঠে আসেন তাঁদের জন্যই তো শিখর ! আমরা শৃঙ্গে সেই ব্যক্তিকে দেখতে চাই অথবা না চাই । তাঁদের বিজয় পতাকাই উড়বে সায়াহ্নে , ভালোলাগুক অথবা না-ই লাগুক । অপরাহ্নের রক্তিম আভায় তাঁরাই হবেন নায়ক : যো জিতা ওহি সিকন্দর ।

এত যুক্তি ও বাদানুবাদে থেকো না মেয়ে , অনুভবে থেকো । আইন আছে কিন্তু আইন একটি অস্ত্র , তস্করকে নিরস্ত্র করার । আইনের এইটুকুই ভূমিকা ।

সে যদি অস্ত্র ফেলে নিজেই শুদ্ধ হয় অথবা অস্ত্র তুলে নেয় অন্যায়ের প্রতিবাদের কারণে তখন কী বা প্রয়োজন শুধু শুধু আইনের মোটা মোটা পুঁথির আর আইনজ্ঞের ? লক্ষ্য শোধন । তা তো হয়েই গেছে , কী বলো ??

বাকিটা বলে উঠি আমি, বেশ দৃঢ়তার সাথেই : বাবাঠাকুরের নির্দেশিত, আমার দুই চোখে লুকিয়ে থাকা আগুনে জারিত , কথাগুলি হল : ডোন্ট জাম্প টু কনক্লুশান .....কোন একটি প্রখ্যাত নাটক আছে না ? সেই নাটকের নামে বলা যায় ---**ওয়েট আন্‌টিল ডার্ক !**

খবর

সাংবাদিক মেখলা ঘোষাল একজন নির্ভীক সাংবাদিক । সত্য ঘটনার ওপরে ভিত্তি করে রিপোর্ট লেখে - তারজন্য বিভিন্ন মানুষ দেখতে ও নানান দেশে গেছে। সাহসী ও সৎ সাংবাদিক হিসেবে বহু পুরস্কারে ভূষিতা । মানুষ ওকে বিশ্বাস করে , ভালোবাসে । ওর প্রতিটি কালির আঁচড় থেকে সাধারণ মানুষ জীবন শুষে নেয়। আর মেখলা ওর উপার্জনের অনেকটাই দান করে একটি দলিতদের জন্য নির্মিত স্কুলকে । সেখানে ও মাঝে মাঝে স্বরচিত নাটক পরিবেশন করে । একটি ছিলো খুব জনপ্রিয় --- মাটির গয়না ।

একবার এক রাজস্থানি উটপালককে নিয়ে একটি বিশাল প্রবন্ধ লেখে । সেখানে অনেক অজানা তথ্য পরিবেশিত হয় । এই রচনাখানি লেখার জন্যে মেখলা , যাকে মানুষ আদর করে ডাকে - মেঘ বলে সেই নীল উজ্জ্বল মেঘ বেশ কিছুদিন

রাজস্থানে গিয়ে সত্যি সত্যি উটপালকদের মধ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে আসে ।

এরকমই একটি রিপোর্ট লেখার জন্যে এক স্বর্ণালী বিকেলে সে পাড়ি দেয় সুদূর এক প্রাচ্যের দ্বীপে । সেখানে মৎস্য শিকারীগণ মহানন্দে মৎস ভোজে ব্যস্ত । মৎস্য মারিবো -খাইবো সুখে !

বড় বড় মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকো নিয়ে ওরা পাড়ি দেয় কোন সে অজানায় !

কেউ কেউ ওখানে তাদের প্রেয়সীদের নিয়ে দিন যাপন করে । কেউ বা দলবল মিলে কেবলই মৎস্য শিকারে ব্যস্ত ।

এরকমই এক নৌকোতে সওয়ারি হবার আশায় মেখলা বা মেঘ , এলো একদিন এই দ্বীপে ।

দ্বীপটি আধুনিক , স্পা ও নানান মাপের রিসর্ট এর শোভা অনেকাংশে বাড়িয়েছে ।

কিছুকাল পূর্বে এক ভয়াবহ সুনামী আসায় প্রায় পুরো সভ্যতাই বিলুপ্ত হয় এখানে । পরে সরকার ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে আবার গড়ে ওঠে নতুন জীবন ।

এই দ্বীপের নাম টিয়ারং নয় , টিরাং ।

টিরাং এক অপূর্ব বনভূমি । নীল সাগরের গান , সাদা ও সোনালী বালুকাবেলা , ঈষৎ বাদামী ও কিঞ্চিৎ গাঢ় লাল ত্রিকোণ

পাহাড় , শিশুরা ড্রয়িং খাতায় যেমন আঁকে অনেকটা সেরকম । আর অজ্রস মাছ , জলে । এই পথ ধরেই নাকি অনেক শিকারী তিমি শিকারে যায় । তারা ঐ বিষয়ে বিজ্ঞ । সেখানে অনেক নারীরাও যায় , তিমি শিকার করতে ।

ওদের বলে হোয়েল হান্টার । এখানে অবশ্যই কিছুদিন আগে তিমি ও ডলফিন শিকার বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে । তবুও অনেক চোরাশিকারি আছেই ।

মেঘ ভাবলো বেশ ভালো প্রবন্ধ লেখা যাবে । একসাথে দুটি বিষয় কভার করবে ।

এক মাঝারি সাইজের হোটেলে ও আছে । জানালা দিয়ে সারাদিন ও রাত্রি সমুদ্র দেখা যায় ।

রাতে পর্যন্ত সিগাল পাখিরা বালিতে হুটোপাটি করে । সার বাঁধা নৌকো সব, কখন দরিয়া থেকে তীরে ভিড়েছে কেউ হিসাব রাখেনি ।

মেঘ সকালে দুধ ও কর্নফ্লেক্স খেয়ে একটু বার হল । মাঝি মল্লাদের সাথে আলাপ করতে চায় । বেশ কিছুদূর অবধি ঘুরে দেখলো । কয়েকজনের সাথে কথা হল ।

কেউ কেউ জানালো যে এখানে নৌকোর বড়মাঝি , মেছোদের ওপরে নাকি ভীষণ অত্যাচার করে । কেউ বললো সুদূর নানান দেশ থেকে , বনজঙ্গল ভেঙে লোকে অন্য দেশে যেতে গিয়ে

আজ এখানে এসেছে অর্থাৎ ওদের ধরে এনেছে ,কেউবা একটু ভালো করে থাকবে বলে আর বেশি রোজগার সেই লোভে নিজেই এসেছে । এখানকার জেলেদের খুব নাম । তারা এমন সব মাছ ধরে যা সারা বিশ্বের মাছ খেকোদের মন ভরাতে পারে । বছরের বেশির ভাগ সময় তারা জলেই কাটায় । তীরে তরী ভিড়লে ওরা নেমে জীবনকে উপভোগ করে ।

একজন জানালো যে দুই জেলের বৌদের এখানে এনে ধর্ষণ করা হয়েছে । করেছে বড় জেলে । যে একটি নৌকোর হেড মৎস্য শিকারী । ঐ দুটি মহিলার স্বামীদের অন্য নৌকো করে সমুদ্রের গভীর পাঠিয়ে বড় জেলে এসব করেছে ।

তারা ভয়ে আইনের সাহায্য নেয় নি ।

করুণ মুখে একজন বললো : আমাদের পেটের ক্ষিধে মেটেনা , আইন টাইন দিয়ে করবো কি ?

মেঘ জানতে চাইলো : আমি কি এরকম একটি নৌকো করে সমুদ্রে যেতে পারি ?

ওরা হেসে বললো : পার্মিশান লাগবে । তবে না যাওয়াই ভালো । ওখানে কেউ ডাঙার আইন মানে না । মদে চুর হয়ে গেলে আর মেয়েমানুষ সামনে থাকলে ওদের অন্য রূপ । মা বেটির তোয়াক্কা ওরা কেউ করেনা । ওরা কাউকে রেয়াৎ করেনা ।

মেঘ দমলো না । তবে কথাও বললো না আর এই বিষয়ে । ও ভেবে দেখবে । জীবনে অনেক আশ্চর্য দুপেয়ে দেখেছে যাদের আদৌ মানুষ বলা যায় কিনা সন্দেহ । তারা অনেকেই আবার সমাজের শিখরে । কাজেই ভয় ও পায় নি কিন্তু আরেকবার বিবেচনা করে দেখতে চায় ।

খবর তো পৌছানো চাই,একবার সম্পাদকের সাথে কথা বলে নেবে ।

সম্পাদক মিস্টার বাগচী ওকে খুবই স্নেহ করেন । ছুটিছাটায় ওর বাড়ি গিয়ে মশালা ডাল ,কাবাব লা জবাব , চিতল মাছের পেটি সমস্ত খাওয়া হয় । ওর স্ত্রী শম্পা বৌদি খুব সুন্দর গান করেন । খাওয়া শেষে ওরা গান শোনে ।

মেঘের ডাক শুনে কেউ শিহরিত না হয়ে পারে ? এবার বৃষ্টি নামবে । ময়ূর পেখম মেলে আকাশ পানে দৃষ্টি হানে । ঠিক সেরকমই বাগচী সাহেব আদেশ দিলেন , যাও , দ্যাখো , জয় করে এসো , আমি না শুনতে চাইনা , তোমার কাছে ।

এইটুকু বার্তাই যথেষ্ট । মেঘের আনাগোনা বাড়লো , জলযানের আশেপাশে ।

দুই একজন তিমি শিকারিও বুঝি দেখা গেলো ।

মোটামুটি স্থির হয়েছে যে এক বার্মিজ মানুষের সাথে ও তার নৌকোতে যাবে ।

ওর নাম দারা । বার্মিজদের বেশিরভাগেরই নাকি নামের সাথে পদবী থাকেনা । একই পরিবারে বিভিন্ন ধরণের নাম দেখা যায় এবং পদবী বিহিন । ওরা সরকারি অনুমতি ছাড়াই নাম বদলাতে পারে ।

দারা জানালো আগে ওদের নৌকোতে একজন কাজ করতো তার নাম মিকো আর বৌ হল চো । সেই মিকো এখন কাজ ছেড়ে দিয়েছে । ওর স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র বাস করে ।

ওদের নাকি আগে একটি মেয়ে ছিলো যার নাম বো । এখন প্রায় ১২টি সন্তান ।

মাঝে মাঝে ওরা এদিকে আসে তখন দেখা হয় ।

মেখলা মনে মনে ভাবে যে লোকটি নির্ঘাত দরিদ্র । কিন্তু সে ১২টি সন্তানের ব্যয়ভার বহনও করছে । কীভাবে ? সাংবাদিকের মনে সব সময় ভাসে প্রশ্ন ।

উত্তর না পাওয়া অবধি স্বস্তি নেই ।

দারাকে জিজ্ঞেস করাতে সে হাসে । মেঘ শুধু জানতে চেয়েছিলো যে মিকো কী করে ?

দারা কেবল হাসে । বলে ওর সাথে দেখা করে দেখুন ।

সেদিন দুপুরে এই দ্বীপের একটি সংবাদ চ্যানেলের এক ক্যামেরাম্যান মেঘকে নিজ নিকেতনে নিমন্ত্রণ জানায় । মেঘ সশরীরে হাজিরা দেয় । পরেছে নীল । মেঘ নীল জামা ও সমুদ্র নীল স্কার্ট । কানে রুবী । হাতে মানাইসই রিস্ট ব্যান্ড । ওকে দেখতে অপরূপা না হলেও বেশ সুশ্রী । আর স্মার্ট । বুদ্ধিদীপ্ত ।

একজন যুবাপুরুষ এগিয়ে এলেন । ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতেই উনি বলে উঠলেন : আপনি নাকি ফিশারম্যানদের নিয়ে লিখবেন বলে এসেছেন ।

মেঘ হেসে বলে : হ্যাঁ , সেটাই উদ্দেশ্য ।

ভদ্রলোক যিনি নিজেকে পিট ক্যাম্পবেল বলে পরিচয় দিলেন উনি এখানকার বেশ গণ্যমান্য ব্যাক্তি । উনি নিজেই যেচে বলেন : এখানে আরো একটি অদ্ভুত খবরের সন্ধান আপনি পেতে পারেন । এখানকার জেলেদের অবস্থা নিয়ে অনেক সংবাদ মাধ্যমই সংবাদ পরিবেশন করেছে । সারা দুনিয়ায় মাছ বিক্রি করা আমাদের দ্বীপে জেলেদের কি নিঠুর পরিণতি । কিন্তু আমি আপনাকে যেই খবর দিতে পারি তা কেউ জানেনা । লিখতে পারেন ঐ ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্যকর এক প্রবন্ধ ।

মেঘ দেখলো যে এ হল গিয়ে মেঘ না চাইতেই জল । কাজেই চটপট করে সমস্ত ডিটেলস্ জেনে নিলো কোথায় গেলে সংবাদটি পাওয়া যাবে ।

সেদিন ভোজন পর্ব শেষ হতে দিকনির্দেশ সম্পর্কে গুগুলে দেখে নিলো যদিও ঐ ভদ্রলোক পিট সব বলে দিয়েছেন ।

রাতে পিটের গাড়ি করেই পৌছালো নিজ হোটেলে । আজব কান্ড হল এই যে যেখানে ঘর ভাড়া করা ওর , এই এক হোটেলে , সেই হোটেল চালান দুই বাঙালী দম্পতি । ভদ্রলোকের মা অবশ্য চাইনিজ মহিলা । ভদ্রলোক কলকাতা , ঢাকা সব ঘুরে এসেছেন । কলকাতার মেয়েকে বিয়ে করে এনেছেন । নাম শিলালিপি ।

খুব সুন্দর নামটি আপনার , আগেই বলেছে মেঘ ।

ওদের বাড়ি এই হোটেলের পেছনে । সেখানেও একবার খাওয়া হয়ে গেছে । শিলালিপি আর রাতুল দুজনে খুবই মিশুকে ।

পরেরদিন ও সেই জায়গার সন্ধানে বার হল । পথে দেখা দারার সাথে । দারা বললো : ঐদিকেই তো থাকে মিকোরা । আপনি মিকোর বাড়িই আদতে যাচ্ছেন ।

সত্যি তো খবরের খোঁজে মিকো , চো, বো -----আরো না জানি কত মানুষ ওখানে ।

মিকোর বাড়ি আসলে একটি বিশাল নৌকো । কিন্তু সেটি ডাঙায় তোলা । দোতলা নৌকো ।

সেখানে নানা আকারে ঘর, ডাইনিং হল বিরাট একটি । আসলে কোনো পরিত্যক্ত বিলাস বহুল নৌকোতে ওরা থাকে । ওর বৌ ছাড়াও ১২টি বাচ্চা । একজন তো বো , আর স্ত্রী হল চো । অন্যরা সবাই নানা আকারের ।

মিকো হেসে স্বাগতম জানালো ।

খুব দরাজ দিল । গরম সবুজ চা দিলো । বললো : চিনি ছাড়া পান করুন ।

তবে চা পান করতে অসুবিধে হলনা ।

বেশ রসিয়ে খেলো মেঘ ।

আকাশে আজ মেঘ নেই । ঝকঝকে নীল আকাশ । মিকো বটগাছের মতন দাঁড়িয়ে আছে ওর পরিবারের পাশে । ওরা ছায়ায় ছায়ায় মায়াজালে জড়িয়ে আছে ।

মিকোর সব কটি বাচ্চা বেশ দুরন্ত ।দুএকটি অবশ্যই ঝিমিয়ে আছে ।

ওরা গরীব নয় তেমন বোঝা গেলো । তবে স্বভাব দোষে হয়ত খরুচে নয় ।

একটু মলিনতার ছাপ সর্বত্র । মিকো জানালো : ও এই মাসেই আরো কিছু টাকা পাবে তাতে একটি বড়সড় খাবার টেবিল কিনবে ।

মেঘ বললো : তুমি কী করো ? মানে তোমার কাজ কি ?

মিকো আর ওর বৌ চো দুজনেই অবাক নেত্রে পরস্পরের দিকে চাইলো । যেন মেঘ জানেনা ওরা কী করে সেটা অবাক হবার মতন ব্যাপার ।

মিকো চুপ করে থাকে ।

ওর বৌ বলে ওঠে : এই নিয়ে অনেক মানুষ আমাদের প্রশ্ন করে গেছে । কিন্তু আমরা মনে করি এটাই আমাদের পেশা । আমাদের মনে কোনো পাপবোধ কিংবা সংশয় নেই ।

মেঘ একটূ অবাক হয় । বলে : আমি তো দারার কাছে জেনেছি তোমরা এমন একটা কিছু করো যা নিয়ে লেখা যায় কিন্তু কী তা জানা নেই , সেটা জানতেই এখানে এসেছি আমি ।

এবার অবাক হল আরো মিকোরা । মিকো ও চো , আর বো ও তার ভাই বোনেরা ।

দুই ভাই নেতিয়ে আছে একটূ । পেটে কাটা ও সেলাইয়ের দাগ ।

সেদিকে আঙুল তুলে এবার স্পষ্ট স্বরে বলে বো : আমরা সবাই কিডনি বিক্রি করি । এটাই আমাদের পেশা ।

এক একটি কিডনি বেচে আমরা অনেক টাকা পাই । বাবা বলেছে পরে বড় বাড়ি কিনবে , ডাঙায় । এই নৌকোটা আমার ছেড়ে দেবো ।

আমরা আর আগের মতন গরীব নেই ।

বাবা আগে মাছ ধরতো , তত আয় হতনা । এখন আমাদের খাওয়াপরার অভাব নেই ।

মায়ের আবার হয়ত ছেলে হবে কয়েক মাস পরে । এইভাবে আমাদের কিডনি সাপ্লাই কখনো শেষ হবেনা । তারপর আমাদের ছেলেমেয়ে হবে , বাবা বলে ।

কলকল করে কথাগুলি বলে চুপ করে গেলো বো ।

চো আর মিকো হাসছে , কোনো অপরাধ বোধ নেই । কিশোর - কিশোরীদের কিডনি বেচে সংসার চালাচ্ছে এখন ওরা । এই কিডনি পাচার চক্র কিন্তু বেআইনি নয় ।

ওরা হাসপাতালে গিয়ে নিজের ইচ্ছেয় কিডনি দিয়ে আসে । তার জন্যে মোটা টাকা পায় ।

যাদের কিডনির অভাবে দিন শেষ হয়ে এসেছে তারা পান নবজীবন ,

চো আর মিকো একে বলে : মানুষের সেবা ।

জীবনটা শুধু দেখার ব্যাপার ; কে কোন কোণ থেকে দেখছে !

প্রত্যেকের নিজস্ব নীতি ও ভাবনা থাকে , এইভাবেই বুঝি ভাঙে রীতি এবং গড়ে ওঠে নবধারা।

ওরা অনেক টাকা করেছে এইভাবে যদিও ব্যাবহারিক জীবনে তার ছাপ দেখা যায়না ।

ওদের ছেলেমেয়েরা বলে যে ওরা আর গরীব নেই ।

ওরা মৃতপ্রায় মানুষকে জীবন দান করে । এইভাবেই বাচ্চাদের মনজয় করেছে বাবা মিকো ও মা চো ।

বড় মেয়ে বো বলে : হাসপাতালে ছিলাম , বেশ ভালো খাবার দেয় ওখানে । আর ফলের রস , হরেক রকম । কি সুন্দর রং আর গন্ধ তাতে ।

মেঘ কাষ্ঠ হাসি দেয় । ওদের কিছু সংবাদ দেবার ছিলো দারার তরফে সেগুলি জানায় । তারপরে বিদায় নেয় ।

সম্পাদক বাগচী সাহেব কৌতুহলী ।আরো জানতে চান , ডিটেলস্ ।

এরকম একটা খবর ছাপাতে পারবেন ভেবে একটু খুশিও ।

কিন্তু বেঁকে বসে মেঘ ।

বলে : স্যার আপনি আর যাই বলুন আমি শুনবো কিন্তু এই ব্যাপারে আর কোনো খবর আমি দিতে অক্ষম । একটি অসহায় মানুষ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে একের পর এক পরিবারের সবার একটি করে কিডনি বিক্রি করে চলেছেন । ওরা হতদরিদ্র আগে তো ছিলোই এখন হয়ত খেতে পরতে পায় ঠিকমতন । এইরকম এক মানুষের কথা খবর হতে পারেনা , এই নিয়ে বরং গল্প হোক , উপন্যাস হোক । কিন্তু সত্য পরিবেশনের কলমে আমি এর কথা লিখতে পারবো না স্যার । আমাকে ক্ষমা করবেন । আজ অবধি আমি আপনার সব কথা মেনে চলেছি অক্ষরে অক্ষরে , আপনিই আমার সাংবাদিকতার গুরু । কিন্তু এই ছোট্ট অনুরোধ যা একজন মানুষের আব্রু রক্ষা করতে পারবে তা আপনাকে রাখতেই হবে । আমি জানি আপনি উত্তম বিচারক । নিউজ ইজ আওয়ার বিজনেস বাট দিস ইজ নট আ নিউজ ।

ইট ইজ আ স্যাড পার্ট অফ হিউমানিটি ।

আমাদের অক্ষমতা , লজ্জা -চেতনার ওপরে বারুদ বৃষ্টি। আমরা শুধরাতে পারি কিন্তু এদেরকে বাজারে বিকাতে পারি না ।

মানুষ এদের কথা জানুক কিন্তু গল্পকথায় ।

এক যে ছিলো রাজা ও তার রাণী --রাক্ষসের হাতে তাদের প্রাণভোমরা -- ঠিক এইরকম --

কিন্তু একে খবর করে আমি অমরত্ব প্রদানে অক্ষম । একজন মানুষ হিসেবে এইটুকু আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে পারি । আবার বলি --এই খবর সংগ্রহকারীকে ক্ষমা করবেন ---এটা খবর নয় ।

ছায়া হিন্দোল

সন্ধ্যা গাঢ় হয় আজকাল । ঝারোখাঝিন্ডি নামক রাজ্যে অন্ধকার নামে ঝুপ করে । দূরে পাহাড় ও কেল্লা , আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটির দখলে । দিনে টুরিস্ট দেখা যায় ওখানে ।

আর এদিকে উপত্যকা । এখানে ছোট শহর । জায়গাটির নাম হাতিগড় । হাতিগড়ে নানান শ্রেনীর মানুষ । বেশির ভাগই চাকুরিজীবি । বাইরের অন্যান্য রাজ্যের মানুষ অনেক ছিলেন বাঙালী , পাঞ্জাবী, মারাঠি , মণিপুরী কিন্তু ইদানিং এই রাজ্যের শাসকের ভয়ে বহু মানুষ রাজ্য ছাড়া । ভিনরাজ্যের মানুষ খেদাও ---এই নীতি নেওয়াতে শাসকদের সম্পর্কে বহু মানুষ সমালোচনা করেছেন আবার ফিরিয়ে নিতে বলেছেন প্রাচীন বাসিন্দা ও ভিনদেশের মানুষদের । যারা দুই তিন পুরুষ ধরে আছেন তারাও নিস্তার পাননি । তল্পিতল্পা গুটিয়ে হানা দিয়েছেন অন্য রাজ্যে । বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ভয়

প্রদর্শন , মারপিট , মেয়েদের সুরক্ষার ব্যাপারে জোর জবরদস্তি , গুন্ডা মার্কা লোকের ভিনদেশীদের আশেপাশে আনাগোনা এইসব অদ্ভুত কান্ড দেখে শুনে প্রায় সকলেই পালিয়েছেন । রয়ে গেছে দুজন মানুষ । সুনয়না ও হিন্দোল । স্বামী স্ত্রী । নি:সন্তান ।

সুদূর বাংলাদেশ থেকে এখানে বহু পথ পেরিয়ে এসেছিলো , আশ্রয়ের খোঁজে । পেয়েছেও । কিন্তু আজকাল হাওয়া গরম । রাতারাতি অনেকেই ঘর ছেড়ে পালালেও ওরা রয়ে গেছে ।

হিন্দোল বলেছে : কোথায় আর যাবো ? মরতে হয় এখানেই মরবো !

আসলে একবার অনেক কষ্ট সহ্য করে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছিলো । পথে না খেয়ে বহু মানুষ ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে । কেউ হাত পা জখম নিয়ে হাসপাতালে মারা যায় । দিনের পর দিন না খেয়ে লোকের নানা অসুখ দেখা দেয় , কানাকড়ি না থাকায় ওরা বিনা পয়সায় -লোকের দোরে দোরে ভিক্ষাও করেছিলো । যা সম্বল ছিলো তা পথেই ডাকাতি ও লুটপাট হয়েছে । গরম ভাতের গন্ধ পেলেই মন উচাটন হত সেই সময় ।

কাজেই এত দু:খ যারা সয় তাদের আর হারাবার কিছু থাকে না । হিন্দোল বলে : যা হয় হবে । কতবার আর বাসা বদলাবো ?

সুনয়না এখানে গুছিয়ে বসেছে । ওদের ছেলেপুলে নেই । এতসব ঝামেলার মধ্যে আর ছেলে পুলের দিকে যায়নি । সুনয়না ডিমের ব্যবসা করে তাই লোকে ওকে বলে ডিমবুড়ি ।

হাঁস মুরগীর ডিমের দোকান ওর । খুব বড় মাপের । এখানে লোকে ডিমকে নিরামিষ ধরে । পেঁয়াজ রসুন হল নিরামিষ । তবে মাংস ও মাছ ইত্যাদি আমিষ । বেশির ভাগই ধার্মিক । আর ওদের মধ্যে যারা উঁচু জাতের তারা নিচু জাতের লোকেদের বিন্দুমাত্র পছন্দ করেনা। ওদের ছায়া মাড়ানো পাপ । বিয়ে শাদি তো একেবারেই হয়না । এখানকার পলিটিক্যাল পার্টি আবার এইসব খুব কন্ট্রোল করে । এক দাদা আছেন । সুখরাম ভাই । সেই ভদ্রলোক খুব কন্ট্রোল ফ্রিক ও সবাইকে ওর কথামতন চলতে হয় ।

ভিনরাজ্যের মানুষদের তাড়ানোর পেছনেও ওদের নিজস্ব যুক্তি আছে । অন্যজাতের মানুষের সাথে ওদের সংস্কৃতি ও আচার বিচারে বিরাট ফাঁক ।

কাজেই নিজেদের ঘরে ওরা নিজেদের নিয়েই থাকতে ইচ্ছুক । অন্যদের হটাও ।

সুনয়নাদের বাড়ির সামনেই থাকে এক ব্যাক্তি । ওর ধন সম্পত্তি অনেক তবে কাজ কিছুই করে না । লোকটি পাড় মাতাল । দিবারাত্রি মদ্যপান করে । একজন স্ত্রী নাকি ছিলো সে কোনো

কারণে চম্পট দিয়েছে । এখন একেবারেই একা । রান্নাবান্না কি করে কেজানে । দিনরাত তো মদ্যপানে ব্যস্ত ।

এই রাজ্যে লোকে খুব মদ খায় । পথেঘাটে , মোড়ে মোড়ে মদের দোকান । সঙ্গে লাগোয়া কাফে । সেখানে স্ক্যাক্স মেলে । বহু মানুষ এমনকি মহিলারাও ওখানে বসে মদ্যপান করে ।

লোকটির ধনসম্পদ যতই থাক সে জাতে নিচু তাই বেশি লোক ওর ধারেকাছে ঘেঁষে না । অনেকে বলে যে হতাশা থেকে ও মদে ডুবে থাকে ।

কাউকে দেখলেই নাকি বলে : আমাকে আরো মদ দাও ! আমাকে মদ দেবে ? আমি স্বর্গে গিয়েও মদ খাবো ! শুনেছি ওখানেও মদের দোকান আছে । আমার মদ খেতে ভালোলাগে !

তোমার বোঝোনা কেন ?

এই হাতিগড় নগরে পাথুরে মাটি , কিঞ্চিৎ অনুর্বর । সেই মাটিতে চাষবাস বেশি করা যায়না । কাজেই সবজির স্বাদ নেই একদমই । প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে তবে রান্না করতে হয় নাহলে সেদ্ধও হয়না । আর ডিম খুব চলে।মোড়ে মোড়ে ডিমের নানাবিধ খাবার দোকান ।

দিগন্ত বিস্তৃত ভূট্টা ক্ষেত । সোনালী ক্ষেতের সারি । দেখে মনে হয় যেন প্রতিরাতে ওখানে , ঐ ধূ ধূ মাঠে কোনো ই-টি এসে

নামে , আকাশযান থেকে । ভিনগ্রহের কোনো অচেনা জীব, এই চেনা পরিধিতে । মিট মিট করে দেখে মানুষের কার্যকলাপ । আমরা কতটা মানুষ থেকে অমানুষ হয়েছি অথবা উল্টোটির প্রচেষ্টায় আমরা কতটা সময় ব্যয় করছি।

হিন্দোল অবশ্য ডিমের ব্যবসাটি শুরু করলেও এখন চালায় সুনয়না আর সে নিজে করে দড়ির ব্যবসা । খুব ভালো চলে । দড়ি নিয়ে বিভিন্ন ভাবে নানা উপায়ে ওরা আরো দড়ি বানায় । কোনোটা জিমে লাগে , কোনোটা দিয়ে নানান দ্রব্য বাঁধা যায় , কোনোটা দিয়ে খাটিয়া তৈরি হয় এইরকম । এই দড়ির কারখানা করে হিন্দোল বেশ পয়সা করেছে , ও শ্রমিকদের সাথে একসাথে বসে খায় । ওদের নানান অসুবিধে হলে বাড়ি চলে যায় । অসুখ বিসুখ হলে নিজে গিয়ে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় কারণ বেশির ভাগ সময় দেখা যায় যে ওরা ডাক্তারের জন্যে খরচ করতে নারাজ ।

বাড়িতে সুনয়না ওকে ক্ষেপায় : তোমার তো হাতিগড় জোড়া সন্তান !

আজকাল ভারতে দড়ির এত স্পেশালিটি এসেছে যে অনেকে শুধু জন্তু জানোয়ার এর জন্যে দড়ি তৈরি করে । শোনা যায় যন্ত্র দ্বারা দড়ি তৈরি - মিশরে বহু যুগ আগে থেকে আছে । ওরা এইসব যন্ত্র আবিস্কার করেছে ।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি একটি দড়ি তৈরির মেশিন এর রেখাচিত্র আঁকেন । পরে অনেক মেশিন আবিস্কৃত হয় । সুনয়না ও হিন্দোলের কারখানায় এরকম নানা মেশিন আছে ।

প্রাকৃতিক তন্তুর সাথে সাথে অন্যান্য সিন্থেটিক তন্তুও ব্যবহার করে ।

বহু মানুষের রুটি রুজি এই কারখানা । হিন্দোল দড়ি তৈরি নিয়ে একটি বই লিখেছে যা পড়ার জন্য ওর দিদির মেয়ে , যার বাবা পাঞ্জাবী -সে বাংলা শিখছে । ও পাঞ্জাবী ও হিন্দি জানে আর ইংরেজি , বাংলা জানে না । হিন্দোল সুনয়নাকে বলে : দেখো এমন বই লিখেছি যা পড়ার জন্যে একজন ভাষাটা শিখতে আগ্রহী , আমার বই লেখা সার্থক নয় কি ?

এবার একটিও বিক্রি নাহলেও আমার চলবে !

সুনয়না হাসে । হিন্দোল খুব মজা করে করে কথা বলে । সবচেয়ে ভালো জমে শীতের সন্ধ্যায় । দূরে পাহাড়ে আলো জ্বলে । এখানে ওরা বাগানে বসে গন গনে চুল্হায় শেঁকে নেয় মাংস , আলু কিংবা বেগুন । আর আগুনের তাপ পোহায় !

কত গল্প হয় তখন । শ্রমিকদের কথা , মানুষের কথা । এই নিরালা ভূমির শাসকদের কথা । নিরালা কারণ ওরা নিজেরা নিজেরা থাকতে চায় , বাইরের কেউ আসবে না !

তফাৎ যাও । ঝারোখাঝিন্ডি তে কোনো বিদেশী ভুলেও নয় !

হিন্দোল বলে : জানো আজকাল আমার শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষদেরই ভালোলাগে । ওদের মধ্যে প্রাণের টান আছে । নাহলে এই যান্ত্রিক যুগে সবাই কেমন মেশিন হয়ে গেছে !

সবাই শুধু মেপে কথা বলা , হাসি , বেদনা জানানো এইসব করে । সরলতা আর নেই ।

আমি ওদের মধ্যেই বেশি আনন্দে থাকি ।

সামনের বাড়ির মানুষটি যাকে লোকে বলে মোদো মাতাল তাকে আজকাল দেখা যাচ্ছে না । বেশ কদিন পরে শোনা গেলো তার নাকি এখন তখন অবস্থা ! সিরোসিস অফ লিভার হওয়াতে ডাক্তার বারণ করেন মদ্যপান করতে । কিন্তু সে শোনার বান্দা নয় ।

ধীরে ধীরে লোকটি , অদ্ভুত ভালো লোকটি ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে । তার তো কেউ নেই । তিনকাল ফাঁকা । মহাশুন্যতা !

হাতিগড়ের মানুষ তার কাছে যাবে না । জাতপাতের ব্যাপার আছে । ঝারোখাঝিন্ডির মানুষ মনে করে একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যাতীত আর কোনো মানুষের মাথায় বুদ্ধি নেই । সবাই বোকা ।

অন্যরা কোনো ফাইন কাজে অক্ষম ।ওরা শুধু খাটার জন্যে জন্মেছে ।

সাধারণ কলম পেশাও ওদের পক্ষে অসম্ভব । উচ্চশ্রেনীর মানুষ এগুলি প্রকাশ্যে বলে বেড়ান । মদ্যপ মৃতপ্রায় মানুষটি নিচু জাতের । তাই কেউ চিকিৎসক এর কাছেও নিয়ে গেলো না তাকে । নামটি খুব অদ্ভুত তার ।

দিলারাম ডাবা । কোথাকার নাম কে জানে ! সুনয়না বললো যে ও নির্ঘাত আগে ডাব বিক্রি করতো কিংবা ওর বংশ ডাব ও নারকোল পাড়তো । শুনে হেসে ওঠে হিন্দোল , হা হা হা করে । খুব হাসলো । তারপরে চোখ ছোট করে বলে : সঠিক জানো ? আমার তো মনে হয় ও ডাব্বাওয়ালা হবার বেশি উপযুক্ত । বরং ডাব্বা । বাড়ি বাড়ি ডাব্বা দিতো !

দুজনেই একযোগে হেসে ওঠে ।

হাসার সময় আর নেই । দিলারাম মৃত । একদিন সকালে ওর বাড়িতে ও মারা গেলো ।

কিন্তু সৎকার করার কেউ নেই । এইদেশে শাসক শ্রেণী সব মানুষকে বিতাড়ন করতে আগ্রহী নিজেদের রাজ্যের লোক ব্যাতীত কারণ অন্য সকলে হীন , মানুষের পর্যায়ে পড়েনা ।

ওরা ইতর শ্রেণী ও লোলুপ । মনুষ্যত্ব নেই কোনো ।

দিনের পর দিন মৃতদেহ কী পড়ে থাকবে ? লোকটি বাড়ির সামনেই চাতালে পড়ে আছে । লিভারে গোলযোগ চরম আকার নিয়েছিলো । ডাক্তার এসে মৃত ঘোষণা করে গেলেন, তাও মরার অনেক পরে, আগে তো কেউ খবর দেয়নি পর্যন্ত । কিন্তু সৎকারের কোনো ব্যবস্থা কেউ করলো না । কেউ আগ্রহ দেখালো না ।

কয়েকবেলা এরকম কাটার পরে হিন্দোল ও তার কয়েকজন শ্রমিক মিলে দড়িতে বেঁধে দিলানাথ ডাবার মোটামুটি পচন ধরা দেহটি নিয়ে গেলো শ্মশান ঘাটে । নদীর পাড়ে শ্মশান । একের পর এক মৃতদেহ চিতায় উঠছে । লাইন দিয়ে অন্য দেহ । অপেক্ষা করছে অগ্নি সংযোগের ।

শেষ হল মানব জমিনের গল্প । এবার অন্য ভুবন , স্বর্গ নরক যাই বলো না কেন ।

সেখানেও ওকে পোড়াতে দেওয়া হলনা । বলা হল নিচুজাতের পট্টি তে নিয়ে যাও ।

সেই স্থানটি আরো দূরে । এতদূরে দেহটি টেনে নিয়ে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেয়েছে শ্রমিক কূল । ওরা ছুটি নিলো । দড়ির খাটে করে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো ।

একজন শ্রমিক বলে : জনাব , ওকে জঙ্গলে ফেলে দিন না , চিল শকুনে খেয়ে যাবে !

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে চাইলো হিন্দোল । বললো : আর কখনো এরকম কথা বলবে না ।উনি আমাদের একজন হলে এরকম কথা বলতে পারতে তুমি ? উনিও মানুষ , আমাদেরই মতন । উনি আমাদের মানুষ ভাই ।

শ্রমিকটি ঈষৎ লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিলো । হয়ত তারও কিছু মনুষ্যত্ব এখনো অবশিষ্ট আছে । মায়া মমতা , স্নেহ ভালোবাসা আন্দোলিত হয় হিন্দোল ও সুনয়নার হৃদয়েও ।তাই বুঝি সুনয়না স্বামীকে এই মহৎ কাজে সঙ্গ দিলো প্রকৃত জীবন সঙ্গিনীর মতন ।

ওরা দুজনে অনেক কষ্টে মৃতদেহটি বহন করে নিয়ে গেলো নিচু জাতের পট্টিতে , আগুন দেবার জন্য । জীবিত থাকাকালীন যেই মানুষটি ওদের ধারকাছেও ঘেঁষতো না , একমাত্র সুরাপাত্র ছিলো যার আভরণ ও মদের দোকান পরম আশ্রয় সেই মানুষটি ছায়ামানুষ হয়ে আজ এই ভিন্নজাতের , ভিন্ন প্রদেশের দম্পতিকে কি ধন্যবাদ জানাচ্ছে ? সুদূর ছায়াপথ থেকে ?

চারপাশ দুলছে কেবল অমিত্রাক্ষর ছন্দে , আকাশে ঘন বাদুলে মেঘ , আর দূরের গ্ল্যালাক্সি থেকে ভেসে আসছে উজ্জ্বল জ্যোতি ---হয়ত দেহ চলে গেলে চেতনা এইভাবেই অন্য ভুবন থেকে

বন্ধু ও স্বজনদের অমৃত এস এম এস পাঠায় । সেই মধুর বার্তা - রেকর্ড করা থাকে অবিনশ্বর কোনো পেন ড্রাইভে যা ডিকোড করতে জানে একমাত্র হিন্দোল ও সুনয়নার মতন মানুষেরাই । নচেৎ কালের গহ্বরে লুকিয়েই থাকে ইপ্সিত এই ক্ষুদ্র পেন ড্রাইভ ।

কেউ কোনোদিনই আর তার নাগাল পায়না ।

The end